ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা: সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
শাহিদুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা
টিআইবি

প্রকাশকাল: জুলাই ২০০৮

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা: সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
শাহিদুল ইসলাম
গবেষণা কর্মকর্তা, টিআইবি

প্রতিবেদন সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম, ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
সাধন কুমার দাস, গবেষণা কর্মকর্তা

পরামর্শ
মো. ওয়াহিদ আলম, ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
মো. জাকির হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা
মো. রেজাউল করিম, গবেষণা কর্মকর্তা

কৃতজ্ঞতা
মো. শাহ্‌নূর রহমান, সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা
নীনা শামসুন নাহার, গবেষণা সহকারী

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি
বাড়ি নং # ১৪১, সড়ক নং # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: (৮৮০ ২) ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮৫৪৪৫৬, ০১৭১৪০৯২৮১৩
ফ্যাক্স: (৮৮০ ২) ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: shahidul@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: http://www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এমন এক সমাজ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন হবে দুর্নীতিমুক্ত এবং জনগণের সেবা দানে নিয়োজিত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক। এই প্রত্যাশা নিয়ে টিআইবি দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৬ সাল থেকে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে আসছে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার ভিত্তি। ব্যক্তির সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার প্রত্যয় তৈরি হয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে। সে কারণে জাতির জন্য একটি সুন্দর ও স্বচ্ছ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই দরকার। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। টিআইবি'র বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির ব্যাপকতাও কম নয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে টিআইবি ইতোপূর্বেই কাজ শুরু করেছে। রিপোর্ট কার্ড জরিপের মাধ্যমে টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সেবার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হলেও কাজের অভিজ্ঞতা থেকে টিআইবি মনে করে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করে প্রাথমিক শিক্ষা সেবার কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়ন শুধুমাত্র সীমিত পরিসরেই সম্ভব।

এই প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও জাতীয় শিক্ষা নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করার অভিপ্রায়ে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। টিআইবি'র গবেষণা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম এই গবেষণাটি পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। এটি একটি গুণগত তথ্য বিশ্লেষণমূলক গবেষণা। এই গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার নানাবিধ সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র ফুটে উঠেছে। গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অনেক কর্মকর্তার কাছ থেকে সক্রিয় সাড়া ও সহায়তা পাওয়া গেছে। অনেক কর্মকর্তা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণাটি সমৃদ্ধ করতে টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের অনেক সহকর্মীসহ অন্যান্য বিভাগের যে সকল সহকর্মী গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে এ গবেষণাটি অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে।

সর্বোপরি এ গবেষণা ফলাফলের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই এই খাতের সমস্যা দূর করে এর মানোন্নয়নে সচেষ্ট হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

মুখবন্ধ	iii
সারণি তালিকা	vi
চিত্রের তালিকা	vi
বক্সের তালিকা	vi
সার-সংক্ষেপ	vii
অধ্যায় এক : ভূমিকা	
১.১ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ধরন	১
১.২ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও তার কার্যাবলী	২
১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জনবল	৪
১.৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা	৪
১.৫ স্বাধীনতার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের গৃহীত উদ্যোগ	৫
১.৬ প্রাথমিক শিক্ষা বাজেট	৭
১.৭ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয়	৭
১.৮ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জন	৮
১.৮.১ প্রাথমিক শিক্ষায় নীট শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি	৮
১.৮.২ প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রস শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি	৯
১.৮.৩ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার	৯
১.৮.৪ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া	১০
১.৮.৫ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ	১০
১.৮.৬ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ	১১
১.৮.৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী	১১
১.৯ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা	১১
অধ্যায় দুই : গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি	
২.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	১২
২.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১২
২.৩ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	১২
২.৪ তথ্যদাতা নির্বাচন পদ্ধতি	১৩
২.৫ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই	১৩
২.৬ তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৪
২.৭ গবেষণার বিশেষত্ব	১৪
২.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৪
২.৯ গবেষণা কাল	১৪
২.১০ প্রতিবেদন কাঠামো	১৪
অধ্যায় তিন : প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যার প্রকৃতি	
৩.১ শিক্ষকরা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে	১৫
৩.১.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা	১৫
৩.১.২ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া	১৬
৩.১.৩ শ্রেণী কক্ষের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় শিক্ষার্থীর আধিক্য	১৬
৩.১.৪ শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার অভাব	১৭
৩.১.৫ শিক্ষকদের দূরদূরান্ত থেকে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়	১৭
৩.১.৬ শিক্ষকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ	১৭
৩.১.৭ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থের স্বল্পতা	১৮

৩.১.৮ এসএমসি, পিটিএ ও কল্যাণ সমিতির কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতার অভাব ১৯
৩.১.৯ নারী শিক্ষকদের প্রতি কমিউনিটি ও ম্যানেজিং কমিটির নেতিবাচক মনোভাব ২০
৩.১.১০ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে শিক্ষকের হয়রানি ২০
৩.১.১১ শিক্ষকদের বেতন-ভাতার স্বল্পতা ২১
৩.১.১২ শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগের অভাব ২২
৩.১.১৩ সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে নারী ও পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা ২২
৩.১.১৪ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি পর্যাপ্ত নয় ২৩
৩.১.১৫ বই পরিবহণ খরচ বিদ্যালয়ের দূরত্ব অনুযায়ী প্রদান না করা ২৩
৩.১.১৬ প্রধান শিক্ষকের উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াতের জন্য ভাতা না থাকা ২৩
৩.২ মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে ২৪
৩.২.১ প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তার অভাব ২৪
৩.২.২ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগের অভাব ২৪
৩.২.৩ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি ২৫
৩.২.৪ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ বহির্ভূত কাজ করা ২৫
৩.২.৫ বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের যাতায়াত ভাতার স্বল্পতা ২৬

অধ্যায় চার : প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.১ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৭
৪.১.১ শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম ২৭
৪.১.২ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফি বা চাঁদা আদায় ২৭
৪.১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৮
৪.১.৪ শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয়ে অনিয়ম ২৯
৪.২ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩০
৪.২.১ মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম ৩০
৪.২.২ শিক্ষকদের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে উপজেলা শিক্ষা অফিসে করণিক কর্তৃক দুর্নীতি ৩০
৪.২.৩ শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩১
৪.২.৪ শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩১
৪.২.৫ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৩
৪.২.৬ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৪
৪.২.৭ বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এমপিওকরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৩
৪.২.৮ সরকারি শিক্ষকদের অবসরে গমন ও বিভিন্ন পাওনা বুঝে পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৬

অধ্যায় পাঁচ : উপসংহার ও সুপারিশমালা
৫.১ উপসংহার ৩৮
৫.২ সুপারিশমালা ৩৯

তথ্যসূত্র ৪১

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলী
পরিশিষ্ট ২: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কার্যাবলী
পরিশিষ্ট ৩: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গঠন প্রণালী
পরিশিষ্ট ৪: স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কার্যাবলী
পরিশিষ্ট ৫: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং গঠন প্রণালী
পরিশিষ্ট ৬: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কল্যাণ সমিতির লক্ষ্য ও গঠন প্রণালী
পরিশিষ্ট ৭: ড. মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৪
পরিশিষ্ট ৮: জাতীয় শিক্ষনীতি ২০০০ এ প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা
পরিশিষ্ট ৯: পিআরএসপি ও প্রাথমিক শিক্ষা
পরিশিষ্ট ১০: বিভিন্ন প্রকারের ফটোকপি বাবদ বার্ষিক আনুমানিক ব্যয়

সারণি তালিকা

	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি ১.১: প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য	১
সারণি ১.২: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জনবল	৪
সারণি ১.৩: প্রাথমিক শিক্ষা বাজেট: ১৯৯৭-২০০৭	৭
সারণি ১.৪: প্রাথমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয়	৮
সারণি ৩.১: সরকারি প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৫
সারণি ৩.২: প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ	১৮
সারণি ৩.৩: সরকারি, রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা	২১
সারণি ৩.৪: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে শূন্য পদের বিভাজন	২৫
সারণি ৪.১: শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম	২৭
সারণি ৪.২: শিক্ষার্থীর নিকট থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফি বা চাঁদা গ্রহণ	২৮
সারণি ৪.৩: একটি উপজেলা শিক্ষা অফিসের করণিক কর্তৃক দুর্নীতির চিত্র	৩০

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১.১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ধরন	১
চিত্র ১.২: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো	২
চিত্র ১.৩: প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা	৪
চিত্র ১.৪: প্রাথমিক শিক্ষায় নীট শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির চিত্র ১৯৯৬-২০০৫	৮
চিত্র ১.৫: প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রস শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির চিত্র ১৯৯৬-২০০৫	৯
চিত্র ১.৬: প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ১৯৯৬-২০০৫	৯
চিত্র ১.৭: প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ১৯৯৮-২০০৪	১০
চিত্র ১.৮: প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর আনুপাতিক হার ১৯৯৬-২০০৫	১০
চিত্র ১.৯: প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষিকার আনুপাতিক হার ১৯৯৬-২০০৫	১১
চিত্র ১.১০: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী ১৯৯৬-২০০৫	১১
চিত্র ৪.১: বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে নিবন্ধন পর্যন্ত আবেদন প্রক্রিয়া	৩৪
চিত্র ৪.২: বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি থেকে স্থায়ী নিবন্ধন	৩৪
চিত্র ৪.৩: শিক্ষক এমপিওকরণের প্রক্রিয়া	৩৫

বক্সের তালিকা

বক্স ১: নারী শিক্ষকের প্রতি ম্যানেজিং কমিটির নেতিবাচক ধারণা সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি	২০
বক্স ২: শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি	৩৩
বক্স ৩: বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি	৩৪
বক্স ৪: শিক্ষক এমপিওকরণে দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি	৩৬
বক্স ৫: শিক্ষক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমন ও পাওনা বুঝে পেতে দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি	৩৭

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

স্বাধীনতার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের বিশেষ মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এর উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এক সময় প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ছিলো খুবই সামান্য, বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ছেলে ও মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ প্রায় সমান। অন্যদিকে নীট এনরোলমেন্ট বেড়েছে আশানুরূপভাবে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার নির্ধারিত বয়সের (৬-১০ বছর) প্রায় ৮৭ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায়ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে যথেষ্ট, শুধু তাই নয় এ ক্ষেত্রে পাশের হারও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত দিক থেকে ক্রমাগত অগ্রগতি সাধিত হলেও এর গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি। ২০০১ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায় পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ৯৮ শতাংশ শিশুই সবগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী (৪৮ শতাংশ) ঝরে পড়ছে। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান রয়েছে এবং এগুলোই প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান ও সেবা নিশ্চিত করার পেছনে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। এই গবেষণায় ঐ সকল সমস্যা ও তা প্রতিকারের উপায় উদ্ঘাটনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

টিআইবি প্রাথমিক শিক্ষা সেবা উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কাল ধরে কাজ করে আসছে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা সেবা উন্নয়নের জন্য রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে শিক্ষক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু কাজের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করা যায় যে, শুধু স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করে প্রাথমিক শিক্ষা সেবার মানোন্নয়ন করা সম্ভব নয়, এটা করতে হলে এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার গভীরে যে সব সমস্যা বিরাজমান রয়েছে সেগুলো উন্মোচন করা দরকার। এই প্রেক্ষাপটে এ গবেষণাটি করা হয়েছে। এটি একটি গুণগত তথ্য বিশ্লেষণমূলক (qualitative data analysis) গবেষণা। এ গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তি পর্যায়ে ৫৯টি নিবিড় সাক্ষাৎকার, ২৯টি এফজিডি এবং ১৭টি কেস স্টাডির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাসঙ্গিক দলিল থেকে পরোক্ষ তথ্য নেওয়া হয়েছে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যার প্রকৃতি

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিরাজিত সমস্যাগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা শিক্ষকদের সমস্যা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমস্যা। নিবে এ সমস্যাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

২.১ শিক্ষকরা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে

২.১.১ শিক্ষক স্বল্পতা: জাতীয় হিসেবে বিদ্যালয় প্রতি গড় শিক্ষক চার জন, কিন্তু শিক্ষকের ছুটি গ্রহণ ও পিটিআই প্রশিক্ষণে থাকার কারণে গ্রামের অনেক বিদ্যালয়ই এক/দুই জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে গড় শিক্ষার্থী ৫৯ জন, রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে ৪৭ জন এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়ে ৪৯। এক জন শিক্ষকের পক্ষে এত সংখ্যক শিক্ষার্থীর তত্ত্বাবধান করা বেশ দুরূহ।

২.১.২ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া: প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে অনেক ছেলে-মেয়ে এনজিও স্কুল ও মাদ্রাসায় চলে যাচ্ছে। কারণ এনজিও বিদ্যালয়গুলোর সময়সূচি গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য বেশ অনুকুল, ফলে অভিভাবকেরা সেখানে ছেলে-মেয়ে পাঠাতে অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষা সহজ হওয়ায় অনেক ছেলে-মেয়ে সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার এবতেদায়ি শাখায় শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৬.৮৭ শতাংশ, অন্যদিকে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭.৭১ শতাংশ। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার আর একটি কারণ হলো অনেকে উপবৃত্তি পাওয়ার আশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, কিন্তু উপবৃত্তির আওতায় আসতে না পারলে তাদের অনেকে বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যায়।

২.১.৩ শ্রেণীকক্ষের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় শিক্ষার্থীর আধিক্য: সরকারি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ প্রতি শিক্ষার্থী ৬৮ জন এবং রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে ৬৩ জন। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে এত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে একসাথে বসার জায়গা দেওয়া সম্ভব নয় বিধায় ৮৮ শতাংশ সরকারি এবং ৯১ শতাংশ রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ক্লাশ নেওয়া হয়। তারপরেও অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দুই জনের জায়গায় ৩/৪ জন করে বসে ক্লাস করতে হয়।

২.১.৪ শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার অভাব: ৭৩ শতাংশ সরকারি এবং ৭০ শতাংশ রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেই। আবার শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এক শিক্ষককে একাধিক বিষয় পড়াতে হয়, ফলে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ তাদের থাকে না।

২.১.৫ শিক্ষকদের দূরদূরান্ত থেকে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়: অনেক শিক্ষক অনেক দূর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে গিয়ে পাঠদান করেন। তারা প্রায়ই বিলম্ব করে বিদ্যালয়ে পৌঁছান আবার ছুটি হবার আগেই বিদ্যালয় থেকে চলে যান।

২.১.৬ শিক্ষকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ: এফজিডি থেকে জানা যায় শিক্ষকদেরকে শিক্ষা ও শিক্ষা বহির্ভূত প্রায় ৭৩ ধরনের কাজ করতে হয়। কাজের চাপে তারা এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, পড়ানোর জন্য তার নিজের যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার অনেকেই তা নিতে পারেন না।

২.১.৭ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থের স্বল্পতা: বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বাৎসরিক আনুষঙ্গিক বরাদ্দ দরকার কমপক্ষে ৬,৮৫০-১০,৬০০ টাকা। কিন্তু বরাদ্দ দেওয়া হয় শুধুমাত্র চক, ডাস্টার, কাগজ, কলম, হাজিরা খাতা এবং রেজিস্টার খাতার জন্য; সরকারি বিদ্যালয়ে ৩০০০-৪২০০ টাকা, রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে ৩০০০ টাকা এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়ে ৩৬০ টাকা। অর্থের অভাবে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভা, অভিভাবক সভা, মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক, বিভিন্ন দিবস পালন, বিদ্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

২.১.৮ ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি ও কল্যাণ সমিতির কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতার অভাব: বেশিরভাগ ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা নিষ্ক্রিয়, বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তাদেরকে পাওয়া যায় না, এমনকি তারা মাসিক সভায়ও আসে না। শিক্ষক অভিভাবক সমিতির অবস্থাও একই, বাস্তবে এটি একটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠান। কলাণ সমিতি একটি কাগুজে সমিতি বৈ অন্য কিছু নয়।

২.১.৯ নারী শিক্ষকদের প্রতি কমিউনিটি ও ম্যানেজিং কমিটির নেতিবাচক মনোভাব: নারী শিক্ষক সম্পর্কে কিছু কিছু জনগণ ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যের ধারণা হলো তারা সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসে না, বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার আগেই চলে যায়, বেশি বেশি ছুটি নেয়, পাঠদানের প্রতি কম মনোযোগি এবং পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে বিদ্যালয়ে এসে অন্য শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে সময় নষ্ট করে।

২.১.১০ শিক্ষকদের বেতন-ভাতার স্বল্পতা: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রারম্ভিক মাসিক বেতন সর্ব সাকুল্যে ৪,৯০০ টাকা থেকে ৫,৭৮০ টাকা, রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ২,৯৫০ টাকা এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের থোক ১,২০০ টাকা। বেতন-ভাতার স্বল্পতার কারণে জীবন জীবিকা নির্বাহের তাগিদে অনেক শিক্ষক অন্যকোনো আয়মূলক কাজে বিশেষ করে কৃষিকাজ ও প্রাইভেট টিউশনির সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। তাছাড়া উচ্চ শিক্ষিতরা চাকুরীর অভাবে এ পেশায় আসলেও, পরবর্তীতে সুযোগ পেলে এ পেশা ছেড়ে চলে যায়।

২.১.১১ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে শিক্ষকের হয়রানি: শিক্ষকদের সকল প্রশাসনিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। কিন্তু এ অফিসে শিক্ষকরা করণিক কর্তৃক হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। টাইম স্কেল, ইবি ক্রস, সার্টিফিকেট সংযুক্তিকরণ, ছুটি, পেনশন প্রভৃতি কাজে করণিক তাদেরকে হয়রানি করে।

২.১.১২ শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগের অভাব: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদক্রম মাত্র দু'টি, যথা সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক। সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের মাঝামাঝি কোনো স্তর না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ খুবই সীমিত। তাছাড়া যারা সরাসরি প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান তাদেরও পদোন্নতির সুযোগ নেই।

২.১.১৩ সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে নারী ও পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা: সহকারী শিক্ষক হওয়ার জন্য নারীদের ক্ষেত্রে সর্বনিব শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ন্বাতক। অথচ উভয়ের ক্ষেত্রেই আর্থিক সুযোগ-সুবিধা একই। এ ব্যবস্থায় কিছু কিছু পুরুষ শিক্ষকের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে।

২.১.১৪ প্রধান শিক্ষকের উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াতের জন্য ভাতা না থাকা: প্রাধান শিক্ষককে অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজে মাসে কমপক্ষে ৩/৪ দিন উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াত করতে হয়, অথচ তাকে এজন্য কোনো প্রকার যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয় না।

২.১.১৫ উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বিদ্যালয়ে বই পরিবহণ খরচ বিদ্যালয়ের দূরত্ব অনুযায়ী প্রদান না করা: উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বই নেওয়ার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়কে থোক ২০০ টাকা করে পরিবহণ খরচ দেওয়া হয়। কিন্তু এ খাতে দূরের বিদ্যালয়ের খরচ উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, অথচ তাদেরকে তা দেওয়া হয় না। অন্যদিকে কাছের বিদ্যালয়ের খরচ কম হয়, কিন্তু তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত নেওয়া হয় না।

২.২ মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে

২.২.১ প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের পদে মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তার অভাব: প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের পদগুলোতে যারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন, মাঠ পর্যায়ে তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই, ফলে মাঠ পর্যায়ের বাস্তব ও যৌক্তিক সমস্যাগুলো তারা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন না।

২.২.২ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগের অভাব: প্রাথমিক শিক্ষায় ৫৭ শতাংশ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ২৯ শতাংশ সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ২০ শতাংশ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ১৩ শতাংশ সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। অথচ নির্দিষ্ট অনুপাতে পদোন্নতির নিয়ম থাকা সত্ত্বেও বিগত এক দশকে কোনো কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

২.২.৩ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের জন্য বরাদ্দকৃত পদ ৯ হাজার ৯২টি। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত রয়েছে ৭ হাজার ২ শত ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে ২০.৭ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে।

২.২.৪ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ বহির্ভূত কাজ করা: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপর রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন তদন্তভার অর্পণ করা হয়, বিভিন্ন জরিপ ও রিলিফ বিতরণ তদারকিতে যুক্ত হতে হয়, তাছাড়া অনেক সময় খোলা বাজারে চাল বিক্রি তাদেরকে দিয়ে মনিটরিং করানো হয়।

২.২.৫ বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের যাতায়াত ভাতার স্বল্পতা: উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হলো প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মূখ্য ব্যক্তি। প্রত্যেক উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে মাসে ১০টি করে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হয়। কিন্তু এ জন্য তাকে যাতায়াত ভাতা হিসেবে মাসে মাত্র ২০০ টাকা প্রদান করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় এ কাজের জন্য উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ কোনো ক্রমেই যথার্থ নয়।

৩. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যেমন নানাবিধ সমস্যা রয়েছে তেমনি এখানে বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি আছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা বিদ্যালয় পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি।

৩.১ বিদ্যালয় পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি

৩.১.১ শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম: প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে নানা অনিয়ম ও অবহেলা রয়েছে। এ সব অনিয়মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কিছু শিক্ষকের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে না আসা, নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠান না করা, ক্লাসের জন্য নির্ধারিত সময় ক্লাসে ব্যয় না করা, পড়ানোর সময় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার না করা, অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে উদ্বুদ্ধ করে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা না করা এবং সকল বিদ্যালয়ে নিয়মিত জাতীয় সংগীত পরিবেশন না করা।

৩.১.২ শিক্ষার্থীর নিকট থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফি বা চাঁদা গ্রহণ: প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো ফি বা চাঁদা নেওয়ার নিয়ম নেই। তথাপি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভর্তি ফি, শ্রেণী উত্তীর্ণ ফি, ক্রীড়ানুষ্ঠানের ফি, পঞ্চম শ্রেণীর বিদায়ের চাঁদা, মিলাদের চাঁদা এবং বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য চাঁদা নেওয়া হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ পরীক্ষার ফি নেওয়ার নিয়ম রয়েছে তার চেয়ে বেশি ফি নেওয়া হয়। সরকার থেকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হলেও কিছু কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে।

৩.১.৩ উপবৃত্তি বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি: উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম লক্ষ করা যায়, যেমন স্থানীয় চাপ ও স্বজনপ্রীতির কারণে উপবৃত্তির আওতায় আসার উপযুক্ত নয় এমন কিছু শিক্ষার্থীকেও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে কোথাও কোথাও উপবৃত্তি দিতে আসা কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন ও যাতায়াত খরচের কথা বলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা নেওয়া হয়।

৩.১.৪ শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয়ে অনিয়ম: প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি মিলে একটি কমিটি গঠন করে শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয় করার কথা, উপজেলা শিক্ষা অফিসের কারো এর সাথে জড়িত থাকার কথা নয়। কিন্তু কোথাও কোথাও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তিনি তার মনোনীত ভেন্ডরের কাছ থেকে সামগ্রী ক্রয় করতে শিক্ষকদের বাধ্য করেন। অনুসন্ধানে দেখা যায় শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বিদ্যালয় প্রতি যে বরাদ্দ (১০ হাজার টাকা) দেওয়া হয় তার প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ অনিয়মের মাধ্যমে নষ্ট হয়।

৩.২ প্রশাসনিক পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি

৩.২.১ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম: অনেক শিক্ষা কর্মকর্তার মধ্যে দায়িত্বের প্রতি স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। কিছু কিছু কর্মকর্তা সঠিক সময়ে অফিসে আসেন না, কিছু কর্মকর্তা নিয়মিত অফিসে না গিয়েও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে সম্পূর্ণ উপস্থিতি নিশ্চিত করেন, সকল বিদ্যালয় সমানভাবে পরিদর্শনের কথা থাকলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো কম পরিদর্শনে যান, কিছু কিছু কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিদ্যালয় থেকে যাতায়াত খরচ নিয়ে থাকেন এবং কিছু কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে শিক্ষকের দায়িত্বে গাফলতি পেলে উৎকোচ নিয়ে পেশাগত শাস্তি থেকে রেহাই দেন।

৩.২.২ শিক্ষকদের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে উপজেলা শিক্ষা অফিসে করণিক কর্তৃক দুর্নীতি: অনেক উপজেলা শিক্ষা অফিসে শিক্ষকদের টাইম স্কেল, ইবি ক্রস, সার্টিফিকেট সংযুক্তিকরণ, বকেয়া বেতন, এরিয়া বিল, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রভৃতি কাজের জন্য করণিককে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে বার বার ঘুরেও কোনো লাভ হয় না, মাসের পর মাস ফাইল চাপা পড়ে থাকে।

৩.২.৩ শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি: শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। তন্মধ্যে পিটিআই প্রশিক্ষণ এবং সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এক বছর মেয়াদি পিটিআই প্রশিক্ষণ চলাকালে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের (শিক্ষক) কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রায় ১,০০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, বুয়ার বিল, আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য চাঁদা, সুইপারের চাঁদা, মসজিদের উন্নয়নের জন্য চাঁদা, বৈদ্যুতিক মেরামত, পানির পাম্প মেরামত, দারোয়ানের বেতন প্রভৃতি খাতে এই চাঁদা নেওয়া হয়। তাছাড়া সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে শিক্ষক প্রতি উপকরণ বাবদ ২৫ টাকা এবং ভাতা বাবদ ৩০ টাকা করে বরাদ্দ থাকলেও অনেক জায়গায় শিক্ষকদের পেছনে সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় করা হয় না।

৩.২.৪ শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অবৈধ আর্থিক লেনদেন কিছুটা কমেছে, কিন্তু পছন্দমত বিদ্যালয়ে পোস্টিং পেতে ঘুষ লেনদেন এখনো চলছে। তাছাড়া জেলা শিক্ষা অফিসকে ম্যানেজ করে পাশাপাশি সিট ফেলে এক জন অন্য জনকে দেখিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ বিদ্যমান রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে ডোনেশনের নামে আর্থিক অনিয়মের ঘটনা ঘটে থাকে। বিদ্যালয় উন্নয়নের কথা বলে শিক্ষক নিয়োগের সময় ২০-৪০ হাজার টাকা করে ডোনেশন নেওয়া হয়। কিন্তু ডোনেশনের টাকা বিদ্যালয় উন্নয়নে ব্যয় না করে অনেক সময় নিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্টরা বণ্টন করে নেয়।

৩.২.৫ শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরনের বদলির ঘটনা দেখা যায়। যথা প্রশাসনিক শাস্তিমূলক বদলি, শিক্ষক সমন্বয় জনিত বদলি এবং স্বেচ্ছায় বদলি। শিক্ষকদের মতে ঘুষ ছাড়া স্বেচ্ছায় বদলি সংঘটিত হয় না। আন্তঃউপজেলা বদলি সংক্রান্ত পাঁচটি কেস স্টাডি পর্যালোচনায় দেখা যায় স্বেচ্ছায় বদলির জন্য সর্বনিব ২,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১২,০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছে।

৩.২.৬ বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার সবসময়ই বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাকে উৎসাহিত করে থাকে। কিন্তু বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধন করতে গিয়ে কোনো কোনো উদ্যোক্তা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকেন। এই সংক্রান্ত তিনটি কেস স্টাডি পর্যালোচনায় দেখা যায়, দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেন সংঘটিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটিতে ২২,২০০ টাকা এবং অন্যটিতে ৬২,৯০০ টাকা। এছাড়া অন্য ঘটনাটির ক্ষেত্রে ঘুষ দিতে হয়নি কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের এক সরকারি কর্মর্তাকে দিয়ে তদবির করাতে হয়েছে।

৩.২.৭ শিক্ষক এমপিওকরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি: শিক্ষক এমপিওকরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে। ঘুষ অথবা তদবির এর যে কোনো একটি ছাড়া এমপিও করানো সম্ভব হয়না। তিনটি কেস স্টাডি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এমপিও'র জন্য দুটিতে ঘুষ দিতে হয়েছে; ঘুষের পরিমাণ একটির ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা এবং অন্যটির ক্ষেত্রে ৩৫,৫০০ টাকা। অন্য একটি ঘটনার ক্ষেত্রে কোনো ঘুষ লাগেনি কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের এক সরকারি কর্মকর্তাকে দিয়ে তদবির করানো হয়েছে।

৩.২.৮ শিক্ষকের অবসরে গমন এবং বিভিন্ন পাওনা বুঝে পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতি: শিক্ষকরা অবসরে গমন ও পাওনা বুঝে পেতে নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, অবসরে গমনের কাগজপত্র প্রক্রিয়া করা থেকে শুরু করে প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন এবং অন্যান্য সকল পাওনা বুঝে পেতে শিক্ষকরা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং হিসাবরক্ষণ অফিসে ঘুষ দিতে বাধ্য হন, অন্যথায় হয়রানির শেষ থাকে না। ছয়টি কেস স্টাডি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অবসরে গমনপূর্বক প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন এং অন্যান্য পাওনা বুঝে পেতে সর্বনিম্ন ৮০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৭,০০০ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে। যারা শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি ছিলেন তাদের কম ঘুষ দিতে হয়, তবে সাধারণ শিক্ষকদের বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়।

৪. সুপারিশ

৪.১ নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের জন্য সুপারিশ

- শিক্ষা সেবা উন্নত করার নিমিত্তে ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত ১:৩০ এ উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদীর ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করার জন্য বিদ্যালয়ের সময়সূচি স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ করে তুলতে হবে।
- শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে ইউনিয়নভিত্তিক কোটা করে সেই ইউনিয়নের প্রার্থীদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে ঐ ইউনিয়নের মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে নিকটতম ইউনিয়ন থেকে নেওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করার জন্য পদক্রম বৃদ্ধি করা দরকার (যেমন সহকারী, সহকারী প্রধান এবং প্রধান শিক্ষক) এবং শুধুমাত্র সহকারী শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগ ও অন্য পদ পদোন্নতি দিয়ে পূরণ করতে হবে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো বর্তমান জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি করা দরকার।
- সরকারি, রেজিস্টার্ড এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ব্যবধান কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত। অর্থাৎ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের বেতন স্কেল বেশি এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের তুলনায় স্নাতক শ্রেণী পাশের বেতন স্কেল বেশি হবে।
- বিদ্যালয় পরিচালনার আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয়ভাবে উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সাপেক্ষে কতিপয় খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি নেওয়ার নিয়ম করা যেতে পারে।
- সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এক জেলার প্রার্থীদের অন্য জেলায় পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।
- রেজিস্টার্ড ও সকল বেসরকারি পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক বাছাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের পদে মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে অন্য বিভাগ থেকে বদলি বা প্রেষণে আনার নিয়ম রহিত করা এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগ ও উপরের সকল পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের নীতি গ্রহণ করা উচিত।
- প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে বর্তমানে ২০.৭ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। যথাশীঘ্র সম্ভব এই শূন্য পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
- জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করাসহ বিদ্যালয়গুলোর কন্টিনজেন্সি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিত।

৪.২ প্রশাসনিক পর্যায়ের জন্য সুপারিশ

- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে শিক্ষকদের হয়রানি বন্ধ ও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা দূর করতে সকল অফিস বোর্ডে কোন কাজ কত দিনে সম্পন্ন হবে তার তালিকা প্রদর্শন করতে হবে।
- শিক্ষকদের শিক্ষা বহির্ভূত কাজে যুক্ত না করা এবং যথাসম্ভব প্রশাসনিক কাজের চাপ কমানোর জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একজন করে অফিস সহকারী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।
- মাঠ পর্যায়ে সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ উপকরণ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভাতা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বিদ্যালয়ে বই নেওয়ার জন্য থোক বরাদ্দের পরিবর্তে প্রকৃত ব্যয় প্রদান করা উচিত।
- সহকারী উপজেলা এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা যাচাইপূর্বক তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। নতুন নিয়োগ দেওয়া কর্মকর্তাদের অবশ্যই বেসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মস্থলে পাঠানো উচিত।
- শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষককে এই প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- প্রশাসনিক কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াতের জন্য প্রধান শিক্ষকের যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বাস্তবসম্মত যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- অধিদপ্তর থেকে কোটেশনের মাধ্যমে ভেন্ডর নিয়োগ দিয়ে তাদের মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিখন শেখানো সামগ্রী পৌছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।
- নারী শিক্ষকদের প্রতি পুরুষ শিক্ষক, অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটির নেতিবাচক মনোভাব দূর করতে তাদেরকে জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.৩ বিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য সুপারিশ

- সরকার থেকে শিক্ষার্থীরা কি কি সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং এগুলো পেতে শিক্ষার্থীর কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে সে সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।
- শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিকল্পে মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও অভিভাবক সভা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। স্থানীয় এনজিওকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
- পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রেণী পরিচালনা এবং পাঠদান নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়গুলোতে উপজেলা শিক্ষা অফিসের মনিটরিং ও সুপারভিশন আরো বাড়াতে হবে।
- এসএমসি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতিকে কার্যকর করতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে তাদেরকে দিয়ে বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা করিয়ে সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাতে হবে।
- এসএমসি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তাদের কাজের উপর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- এসএমসি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতির ৫০ শতাংশ পদে নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে হবে।
- এসএমসি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতির সদস্যদের মাঝে মাঝে ফলোআপ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

অধ্যায় এক
ভূমিকা

১.১ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ধরন

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা স্তর হলো প্রাথমিক শিক্ষা। পাঠক্রম অনুযায়ী এ শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষা মাধ্যমে এই শিক্ষা পরিচালিত। প্রায় ৮০ হাজার ৪ শত ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলো ১০ ভাগে বিভক্ত।[১] এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬ শত ৫৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে এবং এখানে কর্মরত রয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭ শত ৮৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।[২] নিবে বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলে ধরা হলো (সারণি ১.১):

সারণি ১.১: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য (২০০৫)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধরন	বিদ্যালয়		শিক্ষক		শিক্ষার্থী	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৬৭২	৪৬.৮	১,৬২,০৮৪	৪৭.০	৯৪,৮৩,৮৯১	৫৮.৪
বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রা. বি.	১৯,৬৮২	২৪.৫	৭৬,৫৬৬	২২.২	৩৫,৭২,৬৮৬	২২.০
পিটিআই সংযুক্ত পরীক্ষামূলক প্রা. বি.	৫৪	০.১	২২৩	০.১	৯,৮২৮	০.১
কমিউনিটি বিদ্যালয়	৩,০২৭	৩.৮	৮,৭৭৩	২.৫	৪,২৫,৯৯২	২.৬
রেজিস্ট্রেশনবিহীন বেসরকারি প্রা. বি.	৯৪৬	১.২	৩,৪৫৬	১.০	১,৫৮,০৫৯	১.০
এবতেদায়ি মাদ্রাসা	৬,৭৬৮	৮.৪	২৮,২৯৪	৮.২	৮,৪৯,৭৫৫	৫.২
উচ্চ মাদ্রাসার এবতেদায়ি শাখা	৮,৩২৯	১০.৪	৩২,২০৬	৯.৩	১১,৪৬,১৩৮	৭.১
কিন্ডারগার্টেন স্কুল	২,২৮১	২.৭	১৮,৯৩৭	৫.৫	২,৪৬,২৮৬	১.৫
উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা	১,৩৫৩	১.৭	১৩,০৭৫	৩.৮	২,৯৫,৩৩৩	১.৮
এনজিও পরিচালিত স্কুল	২৮৯	০.৪	১,১৭৫	০.৩	৩৭,৬৯০	০.২
মোট	৮০,৪০১	১০০.০	৩,৪৪,৭৮৯	১০০.০	১,৬২,২৫,৬৫৮	১০০.০

[সূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী ২' *বেইজলাইন রিপোর্ট*, জুন ২০০৬]

এই যে ১০ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হলো প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে এগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিদ্যালয়[৩], মাদ্রাসা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবতেদায়ি মাদ্রাসা[৪] এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিদ্যালয়[৫] (চিত্র ১.১)।

চিত্র ১.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ধরন

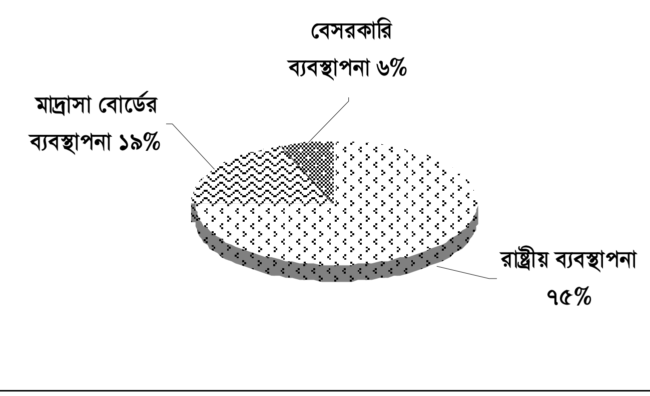

[১] ১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২. বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩. পিটিআই সংযুক্ত পরীক্ষামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪. কমিউনিটি বিদ্যালয় ৫. এবতেদায়ি মাদ্রাসা ৬. উচ্চ মাদ্রাসার এবতেদায়ি শাখা ৭. কিন্ডারগার্টেন স্কুল ৮. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা ৯. রেজি.বিহীন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১০. এনজিও পরিচালিত স্কুল।

[২] প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী ২' *বেইজলাইন রিপোর্ট*, জুন ২০০৬।

[৩] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যায়, পিটিআই সংযুক্ত পরীক্ষামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়।

[৪] এবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং উচ্চ মাদ্রাসার এবতেদায়ি শাখা।

[৫] কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এনজিও স্কুল, রেজিস্ট্রেশনবিহীন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা।

মাদ্রাসা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষা: মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ইসলামী শিক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে। ইসলামী শিক্ষার এবতেদায়ি শাখাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় ১৯ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষা: কিছু কিছু বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত, এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬ শতাংশ, তবে এই বিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত নয়, এগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং এগুলোর উপর রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক শিক্ষা: রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো জনগণকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। রাষ্ট্র প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই দায়িত্ব দিয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এই দায়িত্ব বাস্তবায়ন করছে। প্রায় ৭৫ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাথমিক শিক্ষ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। এ গবেষণায় রাষ্ট্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও তার কার্যাবলী

বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের যাবতীয় কাজ করে থাকে। ছয়টি বিভাগীয় শহর, ৬৪টি জেলা শহর এবং ৪৯৫টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যালয় বিস্তৃত। এছাড়া অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ৫৪টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ৪৮১টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার[৬], তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া নেই, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন করা এগুলোর দায়িত্ব। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মনিটরিং ইউনিট। তাছাড়া জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামোটি নিম্নরূপ:

চিত্র ১.২: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো

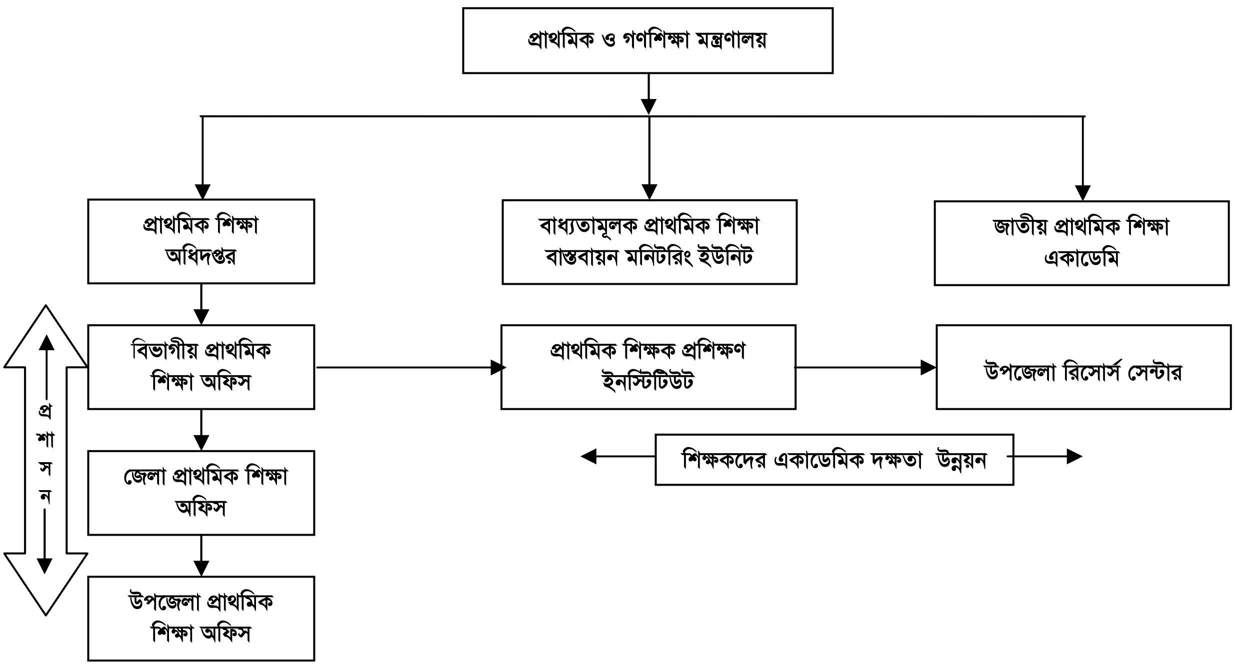

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়: ১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ চালু হয় এবং এটি ২০০৩ সালে মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত নতুন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, পুরাতন আইন ও নীতিমালার সংস্কার সাধন, নতুন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও সুপারভিশন, শিক্ষার অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান করা এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব।

[৬] www.dpe.gov.bd/management_dpe.php (accessed on 2/07/2007).

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর[৭]: ১৯৮১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই অধিদপ্তরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সাল থেকে এটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। অধিদপ্তরের কার্যাবলী পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন হয়ে থাকে, বিভাগগুলো হলো প্রশাসনিক বিভাগ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পলিসি ও অপারেশন বিভাগ। এছাড়া অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সেল। সুনির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটা ব্যাংক তৈরি করা এই সেলের দায়িত্ব।

বিভাগীয় পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা অফিস: প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উপর অর্পিত। উপজেলা এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলো বিভাগীয় অফিসের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অফিসের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পিটিআই প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তঃজেলা বদলি; সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন, ব্যাচেলর অফ এডুকেশন এবং মাস্টার্স অফ এডুকেশন প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের তালিকা তৈরি; বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিবন্ধন করা, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা করা, শিক্ষামূলক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও তদারকি করা, বিদ্যালয় এবং জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম পরিদর্শন করা।[৮]

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস: দেশের প্রতি জেলা পর্যায়ে একটি করে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলো জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের নিয়ন্ত্রণাধীন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দায়িত্ব হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তদারকি করা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আন্তঃউপজেলা শিক্ষক বদলি এবং শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর ভূমিকা পালন করা, শিক্ষক ও কর্মচারীদের ছুটি এবং গ্রাচ্যুইটি অনুমোদন করা, উপজেলা এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন এবং তাদের কার্যক্রম তদারকি ও সুপারভিশন করা।[৯]

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস: দেশের ৪৮১টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস আছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোতে একজন শিক্ষা কর্মকর্তার অধীনে কয়েকজন সহকারী কর্মকর্তা থাকেন। উপজেলার অধীন বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি ক্লাস্টারে ২০-৩০টি বিদ্যালয় থাকে এবং প্রতিটি ক্লাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন একজন করে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। উপজেলা অফিসের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব হলো প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সুপারভিশন করা, আন্তঃউপজেলা শিক্ষক বদলি করা, শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের পেনশন ও গ্রাচ্যুইটির জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রস্তাবনা পাঠানো, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য তালিকা তৈরি করা, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস বা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা, যে এলাকায় বিদ্যালয় নেই সেখানে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ প্রদান করা, শিক্ষকদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা এবং তাদের সার্ভিস বুক হালনাগাদ করা।[১০]

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ইউনিট: এটি সরাসরি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত। প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় বাস্তবায়িত সার্বিক কার্যক্রম সুপারভিশনের দায়িত্ব এর উপর অর্পিত। এ ইউনিটের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব হলো মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সুপারভিশন করা, প্রতি দুই বছর অন্তর জাতীয় শিশু জরিপ এবং সাক্ষরতা জরিপ পরিচালনা করা, যে সকল কমিউনিটি বিদ্যালয় চালু অবস্থায় নেই সেগুলোকে এনজিও'র অধীনে এনে চালু করার ব্যবস্থা করা, সরকারি, রেজিস্টার্ড এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সুপারভিশন করা, বাজেট তৈরি করা এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ তাদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা এবং কন্টিনজেন্সি খরচ প্রদানের ব্যবস্থা করা, যে গ্রামে বিদ্যালয় নেই সেখানে এনজিও'র মাধ্যমে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সেবা ও সহায়তা প্রদান করা।[১১]

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি: এটি হলো দেশের একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার কোনো প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনিক দায়িত্ব এর উপর নেই। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর দায়িত্ব হলো প্রাথমিক শিক্ষক প্রশাসক, সুপারভাইজার, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তাদের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ

---

[৭] প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

[৮] www.dpe.gov.bd/management_dpe.php (accessed on 10/07/2007).

[৯] প্রাগুক্ত।

[১০] প্রাগুক্ত।

[১১] www.mopme.gov.bd/CPEIMU_responsibility.htm (accessed on 10/07/2007).

দেওয়া, প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য কার্যকর গবেষণা করা, পিটিআই প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশনা উপকরণ ও মডিউল তৈরি করা, শিক্ষকদের সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন পরীক্ষা পরিচালনা ও সুপারভিশন করা এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা এবং পঞ্চম শ্রেণী পাশের সমাপনী পরীক্ষার মডেল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে অধিদপ্তরকে সহায়তা করা, প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম তৈরি, শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালার আয়োজন করা এবং প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে মোবাইল টিমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ফলোআপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।[১২]

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জনবল

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব খাত ও পিইডিপি-১ এর অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ে ৯ হাজার ৯২টি পদ বরাদ্দ রয়েছে, তবে উল্লিখিত পদে বর্তমানে ৭ হাজার ২ শত ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। নিবে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিভাজন দেখানো হলো (সারণি ১.২):

সারণি ১.২: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জনবল

বিভিন্ন পর্যায়ের অফিস	১ম শ্রেণী কর্মকর্তা		২য় শ্রেণী কর্মকর্তা		৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী		মোট	
	বরাদ্দ পদ	কর্মরত	বরাদ্দ পদ	কর্মরত	বরাদ্দ পদ	কর্মরত	বরাদ্দ পদ	কর্মরত
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৬৮	৬২	২২	১৫	১৬৪	১৪৩	২৫৪	২২০
বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	১৮	১৩	-	-	৫৬	৫০	৭৪	৬৩
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	১৩৬	৭৮	৬৪	৪৩	৪৯৬	৪২০	৬৯৬	৫৪১
উপজেলা শিক্ষা অফিস	৫১১	৪০৮	২,১০২	১,৮৩০	১,৯৮৪	১,৭৫৬	৪,৫৮৮	৩,৯৯৪
প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৭৪৮	৪৬৮	-	-	৮০৮	৫৩৩	১,৫৫৬	১,০০১
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার	৪৮১	৩৬৩	৪৮১	২৩০	৯৬২	৮০০	১,৯২৪	১,৩৯৩
মোট	**১,৯৬২**	**১,৩৯২**	**২,৬৬৯**	**২,১১৮**	**৪,৪৬১**	**৩,৭০২**	**৯,০৯২**	**৭,২১২**

[সূত্রঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭]

১.৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সাথে শিক্ষক, স্থানীয় জনগণ ও সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন জড়িত। এই তিন শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষকের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও সুপারভিশন করে থাকে। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানসহ বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে, পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দিয়ে সহায়তা করে থাকে।[১৩] ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি), শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি (পিটিএ) এবং কল্যাণ সমিতি এগুলো শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে গঠিত। অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে স্বার্থক করে তোলার জন্য এ কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে।

চিত্র ১.৩: প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

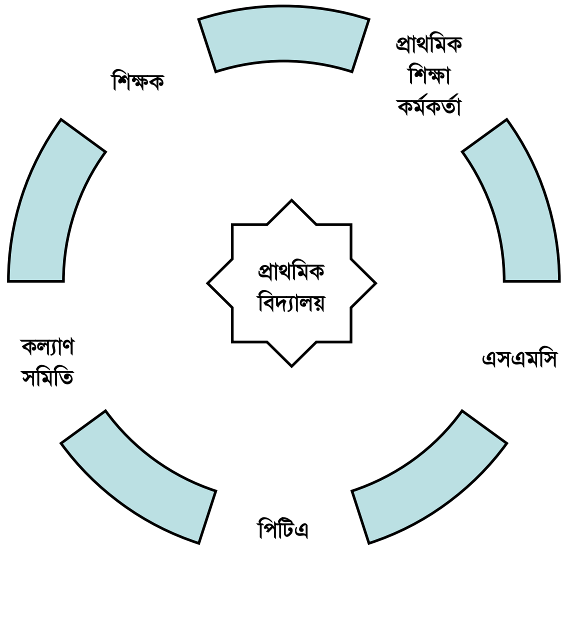

ম্যানেজিং কমিটি: বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কার্যাবলী মনিটরিং, শিক্ষক-ছাত্রের উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্যপরায়ণতা, পাঠদান তদারকি এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির উপর অর্পিত।[১৪]

---

[১২] www.mopme.gov.bd/Nape_functions.htm (accessed on 10/07/2007).

[১৩] শিক্ষকদের কার্যাবলী সম্পর্কে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

[১৪] ম্যানেজিং কমিটির গঠন সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ৩ এবং এর দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি: স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা, জবাবদিহিতা, সামাজিক সম্পৃক্ততা ইত্যাদির সাথে শিক্ষক-অভিভাবকদেরকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ' সফলভাবে বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়কে একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই হলো শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির লক্ষ্য।[১৫]

কল্যাণ সমিতি: স্থানীয় পর্যায় থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও গরীব শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সহায়তা করা এই সমিতির লক্ষ্য।[১৬]

১.৫ স্বাধীনতার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের গৃহীত উদ্যোগ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয় সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[১৭] স্বাধীনতার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্র যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

শিক্ষা কমিশন: শিক্ষার একটি রূপরেখা প্রণয়নের নিমিত্তে ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন ১৯৭৪ সালে রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয়, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে গণ্য করে তাকে সার্বজনীন করতে হবে। বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে।[১৮] প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তারা সকলেই প্রায় অভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেন। সকলে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেছেন। সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ২০০৩ সালে। কমিশনের সুপারিশে স্কুল ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে আরো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে ছয়টি করে শ্রেণী কক্ষ এবং ছয় জন করে শিক্ষক বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে, পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ করার সুপারিশ করা হয়েছে।[১৯]

জাতীয় শিক্ষানীতি: শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালে দেশের প্রথম শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়নে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এখানে শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়, বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৪০। প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করতে তাদের জাবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। এছাড়া মেধাভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল বস্তুনিষ্ঠভাবে বিন্যাস করে এবং তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করার কথা বলা হয় জাতীয় শিক্ষানীতিতে।[২০]

এমডিজি ও পিআরএসপি: জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ এমডিজিকে সামনে রেখে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় নীট অন্তর্ভুক্তি শতকরা একশত ভাগ এবং ঝরে পড়ার হার শূন্যতে নিয়ে আসার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এমডিজি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যে দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন করেছে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সকল বালক বালিকাকে কিভাবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে পিআরএসপিতে সেই কৌশলগুলো তুলে ধরা হয়েছে।[২১]

---

[১৫] শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গঠন সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

[১৬] কল্যাণ সমিতির লক্ষ্য ও গঠন সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

[১৭] জাতীয় সংবিধানের ১৫ ধারায় বলা হয় "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে ..... নাগরিকদের জন্য ..... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা......।" সংবিধানের ১৭ ধারায় বলা হয় "রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষা সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

[১৮] মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন-১৯৮৮, শামসুল হককমিশন-১৯৯৭, এম. এ. বারী কমিশন-২০০২ এবং ড. মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশন-২০০৪।

[১৯] ড. মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ এর জন্য পরিশিষ্ট ৭ দেখুন।

[২০] পরিশিষ্ট ৮ এ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা দেখুন এবং বিস্তারিত জানতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *জাতীয় শিক্ষানীতি*, ২০০০ দেখুন।

[২১] প্রাথমিক শিক্ষার উপর পিআরএসপি'র ম্যাট্রিক্স এর জন্য পরিশিষ্ট ৯ দেখুন।

প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন প্রণয়ন: সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন পাশ করে। এই আইন অনুযায়ী ৬-১০ বছর বয়সের সকল বালক বালিকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৯২ সালে ৬৪টি জেলার ৬৮টি থানাকে এই আইনের অধীনে আনা হয়, পরবর্তীতে ১৯৯৩ সাল থেকে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়।

৬০ শতাংশ শিক্ষক পদে নারী শিক্ষক নিয়োগের নীতি গ্রহণ: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমল মতি শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য শাসন নয়, দরকার স্নেহ। এই উপলব্ধি থেকে সরকার চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী (১৯৯০-১৯৯৫) পরিকল্পনায় বিদ্যালয়গুলোতে ৬০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগের নীতি গ্রহণ করে। এখনো এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন: প্রাথমিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য সরকার স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সরকার ১৯৭৮ সালে Academy for Fundamental Education প্রতিষ্ঠা করে, পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে এটিকে National Academy for Primary Education এ রূপান্তর করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য ১৯৮১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৩ সালে এই বিভাগটিকে মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয় এবং এরপর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বিদ্যালয়ে বালক-বালিকার অধিগম্যতা বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া হ্রাস করার উদ্যোগ

কমিউনিটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: জনগণ ও সরকারের যৌথ অংশগ্রহণে কমিউনিটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ বিদ্যালয় নির্মাণের জায়গা প্রদান করে এবং সরকার লজিস্টিক দিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সরকার থেকে মাসিক হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্মানী প্রদান করা হয়।

স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা: পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৪টি স্কুল দিয়ে এ কর্মসূচী শুরু হয় এবং ২০০১ সাল অবদি ৫ হাজার স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৩ সালের শেষে এই প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুরা যারা দূরের বিদ্যালয়ে যেতে পারতো না তাদেরকে এই স্কুলে ১ম - ২য় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হতো। স্বেচ্ছা সেবকের ভিত্তিতে নারী শিক্ষক দ্বারা এই বিদ্যালয় পরিচালিত হতো।

বিনামূল্যে বই বিতরণ: ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ তৈরি করতে স্বাধীনতার পর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। তার পরেও দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুর পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, সে কারণে ১৯৮৫ সাল থেকে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করে আসছে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি: ১৯৯৩ সালে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়। দেশের ৪৬০টি থানার ৪৬০টি ইউনিয়নের প্রায় ২.২ মিলিয়ন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে এই কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০২ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হয়।

উপবৃত্তি কর্মসূচি: ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে দেশের ৩২০৮টি ইউনিয়নে সর্বপ্রথম উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ সাল থেকে সারা দেশে উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় শর্ত সাপেক্ষে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বিদ্যালয়ের ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। একই পরিবার থেকে একাধিক শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলে সেই পরিবারকে মাসে ১২৫ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং এক জন হলে মাসে ১০০ টাকা করে প্রদান করা হয়।

স্কুল টিফিন কর্মসূচি: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর (ডব্লিউএফপি) সহায়তায় এই কর্মসূচি প্রথমে লালমনির হাট ও কুড়িগ্রাম জেলায় এবং ঢাকা শহরের বস্তি এলাকায় বাস্তবায়ন করা হয়। পরে এই কর্মসূচি যশোর, কুষ্টিয়া, পঞ্চগড়, চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। এই কর্মসূচির অধীনে দুপুরে শিক্ষার্থীকে ৭৫ গ্রাম পুষ্টিকর বিস্কুট দেওয়া হয়। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে এবং এর দ্বিতীয় পর্যায় ২০১০ সাল পর্যন্ত চলবে।

বিদ্যালয় আকর্ষণীয়করণ কর্মসূচি: শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী করার জন্য ১৯৯১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দেশের ১০টি উপজেলার ৬৮৯টি বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে এমন দরিদ্র শিক্ষার্থী বিশেষকরে মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা উপকরণ, ইউনিফর্ম, খেলাধুলার সামগ্রী এবং মাঝে মাঝে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। প্রায় ৪ লক্ষ শিক্ষার্থী এই কর্মসূচির আওতায় সহায়তা পেয়েছে। ঝরে পড়ার হার হ্রাস ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ কর্মসূচিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে শিক্ষকদের জন্য রয়েছে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন প্রশিক্ষণ, ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ এবং প্রধান শিক্ষকের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক সহায়তা ও তদারকি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। তাছাড়া ম্যানেজিং কমিটিকে তাদের দায়িত্ব পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা: প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শিক্ষকরা যাতে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করার জন্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের প্রশিক্ষক ও সহকারী প্রশিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষাকদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ তদারকি করে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকেন।

শিখন শেখানো উপকরণ সরবরাহ: শিক্ষাদানের সাথে সাথে বিষয়গুলোকে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে দৃশ্যমান করে উপস্থাপন করা যায়, সে বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিদ্যালয়গুলোতে শিখন সেখানো উপকরণ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর ফলে পাঠদান সহজ, সাবলীল ও শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়, ফলে তারা সহজে পড়া আত্মস্থ করতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ২: প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে বর্তমান সময়ে বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি অন্যতম। বাংলাদেশ সরকার ও আরো ১০টি দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানে ১৮১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই প্রকল্পটি ২০০৩ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় যা ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্প বাজেটের ৬৩.৯ শতাংশ বহন করছে বাংলাদেশ সরকার এবং বাকি অংশ দাতা সংস্থা, তবে দাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক (৮.৩ শতাংশ)। এই প্রকল্পে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি এই কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১.৬ প্রাথমিক শিক্ষা বাজেট

গত এক দশকে জাতীয় বাজেটের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেট ছিলো ২৬,৭০০ কোটি টাকা, ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৯,৭৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত দশ বছরে জাতীয় বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৬১ শতাংশ। জাতীয় বাজেট বৃদ্ধি পেলেও বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার আনুপাতিক বরাদ্দ কিন্তু বাড়েনি, বরং বেশিরভাগ বাজেটেই তা কমেছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার বরাদ্দ ছিলো ৭.২ শতাংশ অথচ ১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ দেওয়া হয় জাতীয় বাজেটের যথাক্রমে ৭.০, ৬.৯৭, ৫.৮১, ৫.৪৭, ৪.৭৯ এবং ৬.২৪ শতাংশ। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না (সারণি ১.৩)।

সারণি ১.৩: প্রাথমিক শিক্ষা বাজেট (কোটি টাকায়): ১৯৯৭-২০০৭ (সংশোধিত)

সন	উন্নয়ন ব্যয়	অনুন্নয়ন ব্যয়	মোট ব্যয়	জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার অংশ %
১৯৯৭-১৯৯৮	৭৮৪	১১৫১	১৯৩৫	৭.২
১৯৯৮-১৯৯৯	৯৫৩	১২০৩	২১৫৩	৭.০
১৯৯৯-২০০০	১১২২	১৩১৩	২৪৩৫	৬.৯৭
২০০০-২০০১	১৩৭৪	১৩৫১	২৭২৫	৭.৩৪
২০০১-২০০২	১২২২	২৪৪২	৪১০৪	১০.৩৯
২০০২-২০০৩	১৪৮৬	১১২০	২৬০৬	৫.৮১
২০০৩-২০০৪	১০৭২	১৬৩০	২৭০২	৫.৪৭
২০০৪-২০০৫	৮৬৬	১৮০৪	২৬৭০	৪.৭৯
২০০৫-২০০৬	১৬৯৫	২১২৪	৩৮১৯	৬.২৫
২০০৬-২০০৭	১৭৯৭	৩২০২	৪৯৯৯	৭.৪৮

[সূত্র: বাজেট প্রতিবেদন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদন ‘হালখাতা’ পিপিআরসি, মে, ২০০৬]

১.৭ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয়

বিগত ১০ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় পর্যালোচনায় আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় সামান্য হলেও বেড়েছে। যেমন ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় ছিলো ১,০৭৩ টাকা, ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে সেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৮৭ টাকা। কিন্তু যদি মূল্যস্ফীতিকে গণনায় আনা হয় তাহলে দেখা যাবে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয়

বাড়েনি, বরং কমেছে। কারণ বরাদ্দ যতটুকু বাড়ানো হয়েছে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে তার তুলনায় বেশি। অন্যদিকে ২০০১-০২ অর্থ বছরে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ২,৩২৩ টাকা কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে তা ১৫ শত টাকারও নিচে নেমে যায়, আবার ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় বেড়ে ২,৩৫৩ টাকায় দাঁড়ায়। এভাবে কোনো কোনো বছর হঠাৎ ব্যয় বেড়ে পরবর্তী বছরগুলোতে আবার নিচে নেমে যাওয়াকে কোনো ভাবেই স্বাভাবিক প্রবণতা বলা চলে না। কাজেই বিগত ১০ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয় পর্যালোচনা থেকে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় বেড়েছে এ কথা বলা যায় না। নিম্নের সারণিতে (১.৪) প্রাথমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থীর বিগত ১০ বছরে মাথাপিছু ব্যয় তুলো ধরা হলো:

সারণি ১.৪: প্রাথমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয়

সন	উন্নয়ন ব্যয় (টাকা)	অনুন্নয়ন ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১৯৯৭-১৯৯৮	৪৩৫	৬৩৮	১,০৭৩
১৯৯৮-১৯৯৯	৫১৯	৬৫৪	১,১৭৩
১৯৯৯-২০০০	৬৩৭	৭৪৫	১,৩৮২
২০০০-২০০১	৭৭৮	৭৬৪	১,৫৪২
২০০১-২০০২	৬৯২	১,৬৩১	২,৩২৩
২০০২-২০০৩	৮৪৬	৬৩৭	১,৪৮৩
২০০৩-২০০৪	৫৮২	৮৮৪	১,৪৬৬
২০০৪-২০০৫	৪৮২	১,০০৫	১,৪৮৭
২০০৫-২০০৬	১,০৪৫	১,৩০৮	২,৩৫৩

[সূত্র: সারণি ২.১ বিশ্লেষণ]

১.৮ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জন

প্রাথমিক শিক্ষার বেশ কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে। কয়েকটি নির্দেশকের মাধ্যমে এই অর্জনগুলো পরিমাপ করা হয়। নিবে বিগত দশ বছরের উপাত্তসহ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জনের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করা হলো:

১.৮.১ প্রাথমিক শিক্ষায় নীট[22] শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে এনরোলমেন্টের কথা। বিগত ১০ বছরে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় নীট এনরোলমেন্ট ছিলো ৭৮.৫ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ৮৭.২ শতাংশে উন্নীত হয়। অর্থাৎ ১০ বছরে নীট এনরোলমেন্ট বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। তবে ২০০৩ সালে সারা দেশব্যাপী উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু হওয়ায় ২০০৩ ও ২০০৪ সালে নীট এনরোলমেন্ট হঠাৎ করে ৮৬.৭ শতাংশ (২০০২) থেকে বেড়ে যথাক্রমে ৯১.৬ ও ৯২.০ শতাংশে উন্নীত হয়, কিন্তু এই হার ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ অনেক দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীর পক্ষে উপবৃত্তির শর্ত পূরণ করা সম্ভব না হওয়ায় তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেছে (চিত্র ১.৪)।

চিত্র ১.৪: প্রাথমিক শিক্ষায় নীট শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির চিত্র: ১৯৯৬-২০০৫

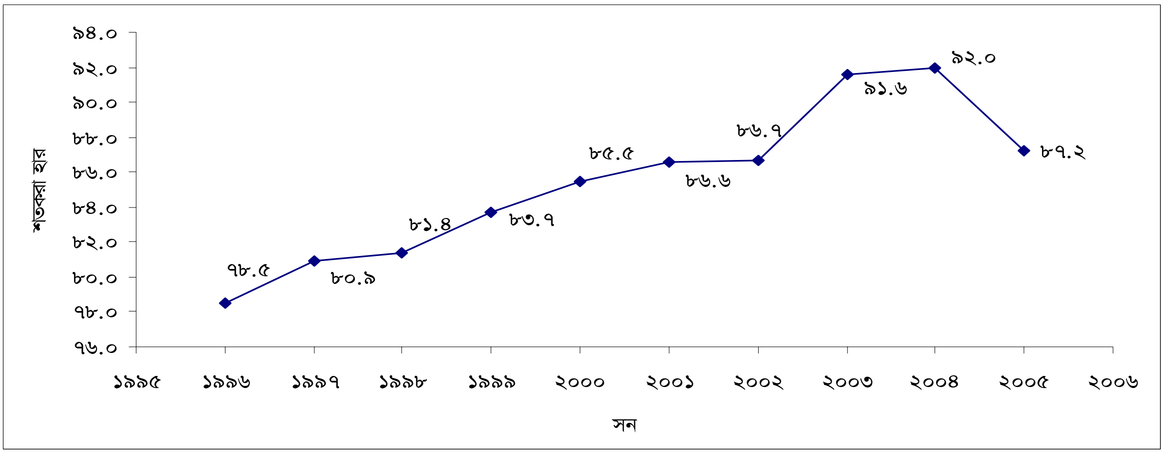

[Bangladesh Educational Statistics 2006, Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS), Dhaka]

[22] প্রাথমিক শিক্ষার সরকারি বয়স ৬-১০ বছর। এই বয়সের সকল শিশুদের যে অংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে তার শতকরা হারকে প্রাথমিক শিক্ষার নীট এনরোলমেন্ট বলে।

১.৮.২ প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রস[২৩] শিক্ষার্থী অর্ন্তভুক্তি

বিগত ১০ বছরে নীট এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি পেলেও গ্রস এনরোলমেন্ট হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৬ সালে গ্রস এনরোলমেন্ট ছিলো ৯৫.০ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ৯৩.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ গ্রস এনরোলমেন্ট ১.৩৭ শতাংশ কমেছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত একটি স্বাভাবিক গতিতে গ্রস এনরোলমেন্ট বাড়ছিলো, কিন্তু ২০০৩ সালে উপবৃত্তি কর্মসূচী শুরু হওয়ায় গ্রস এনরোলমেন্ট হঠাৎ ৯৭.৩ শতাংশ (২০০২) থেকে বেড়ে ১০৪.৮ শতাংশ হয়। কিন্তু শর্ত পূরণ করতে না পেরে উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে অনেকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। অন্যদিকে ২০০৪ সালে ৪৮২৩টি স্যাটেলাইট স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রস এনরোলমেন্টের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে (চিত্র ১.৫)।

চিত্র ১.৫: প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রস শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির চিত্র: ১৯৯৬-২০০৫

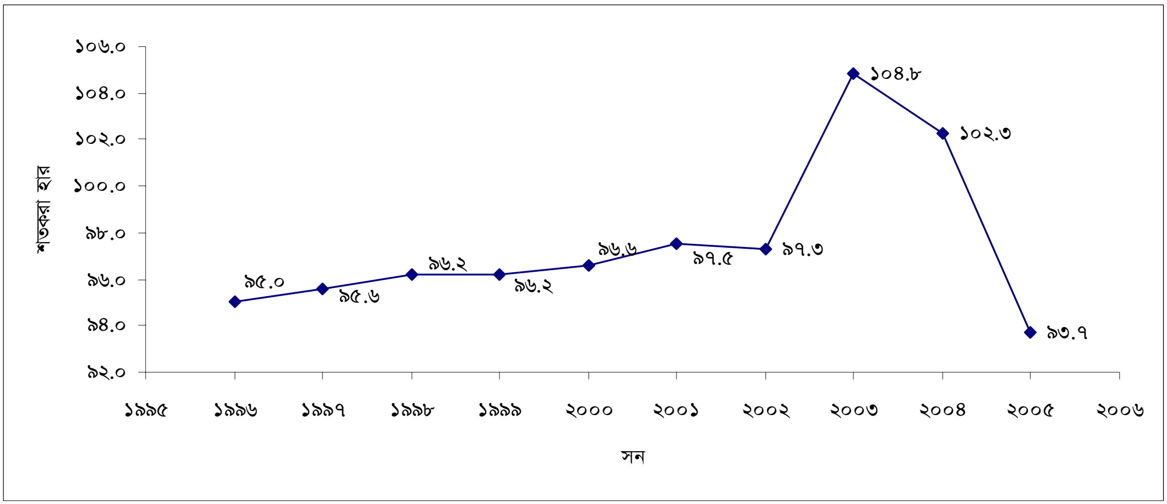

[Bangladesh Educational Statistics 2006, Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS), Dhaka]

১.৮.৩ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার

প্রাথমিক শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সফলতা এসেছে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের ক্ষেত্রে। বর্তমানে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ৪০ শতাংশের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের উপর ব্যাপক প্রশাসনিক চাপ রয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে পাশের হার। ১৯৯৬ সালে যেখানে বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ছিলো ১২.১ শতাংশ ২০০৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (চিত্র ১.৬)।

চিত্র ১.৬: প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পশের হার ১৯৯৬-২০০৫

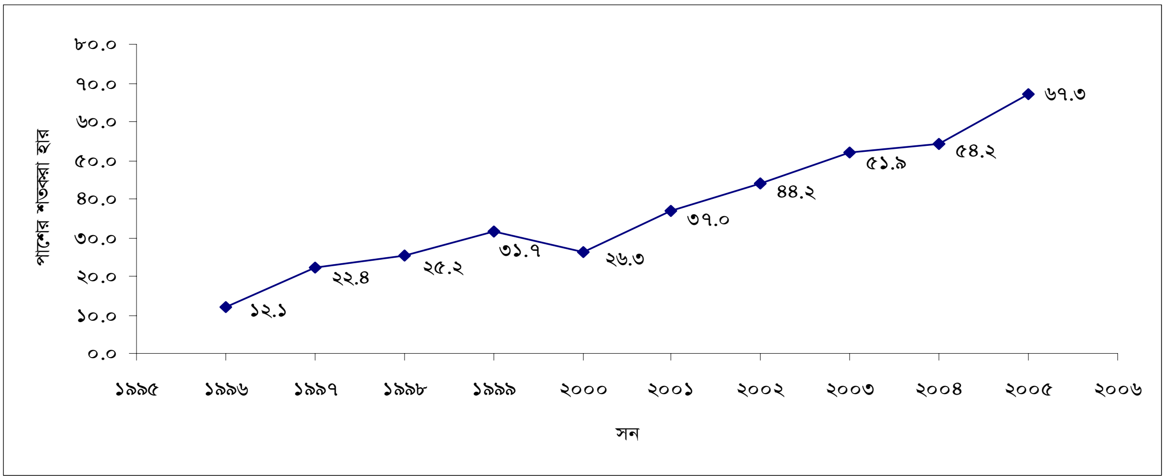

[www.dpe.gov.bd/archive.php (accessed on 10/07/2007)]

[২৩] প্রাথমিক শিক্ষার সরকারি বয়স ৬-১০ বছর, কিন্তু এই বয়স সীমার বাইরের অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ৬-১০ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত সকল শিক্ষার্থীর শতকরা হারকে গ্রস এনরোলমেন্ট বলে।

১.৮.৪ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে ঝরে পড়ার হার ছিলো ৩৫ শতাংশ যা ২০০২ সালে কমে ৩২ শতাংশে উপনীত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালে এসে দেখা যায় ঝরে পড়ার হার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। ২০০৪ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৪৮ শতাংশ (চিত্র ১.৭)।

চিত্র ১.৭: প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার: ১৯৯৮-২০০৪

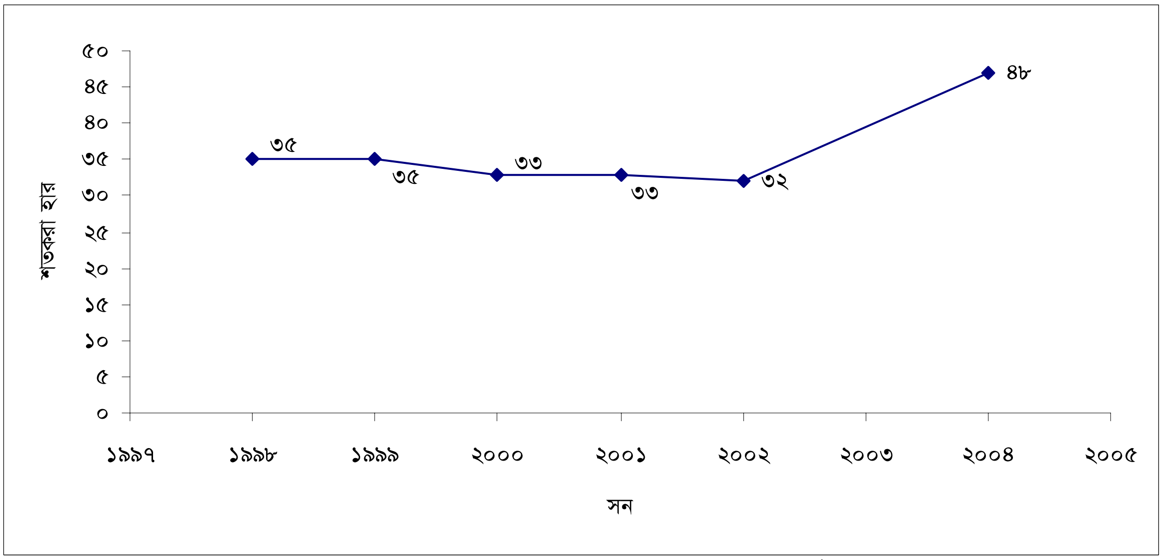

[www.dpe.gov.bd/archive.php (accessed on 10/07/2007) এবং প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদন ‘*হালখাতা*’ পিপিআরসি, এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ৭৭]

১.৮.৫ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো লিঙ্গভিত্তিক সমতা। ১৯৯৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ছিলো ৪৭.৬ শতাংশ এবং ছাত্র ছিলো ৫২.৪ শতাংশ, ২০০৫ সালে এসে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমান হয়েছে। বর্তমানে ছাত্রী ৫০.১ শতাংশ এবং ছাত্র ৪৯.৯ শতাংশ। অর্থাৎ ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী বেশি (চিত্র ১.৮)।

চিত্র ১.৮: প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর আনুপাতিক হার ১৯৯৬-২০০৫

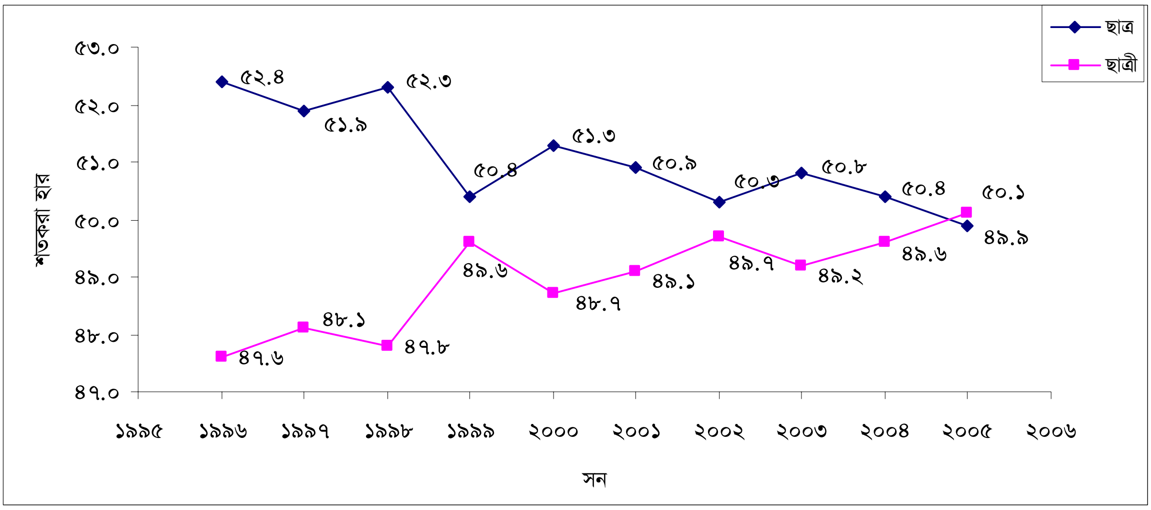

[Bangladesh Educational Statistics 2006, Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS), Dhaka]

১.৮.৬ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ

সরকারের নীতি অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ নারী শিক্ষক থাকার কথা। এ লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রতি নিয়োগে নারীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে, ফলে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে শিক্ষক-শিক্ষিকার আনুপাতিক হার ছিলো যথাক্রমে ৭৫.৩ ও ২৪.৭ শতাংশ, ২০০৫ সালে এই ব্যবধান হ্রাস পেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত হয় যথাক্রমে ৬৩.৮ ও ৩৬.২ শতাংশ (চিত্র ১.৯)।

চিত্র ১.৯: প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষিকার আনুপাতিক হার ১৯৯৬-২০০৫

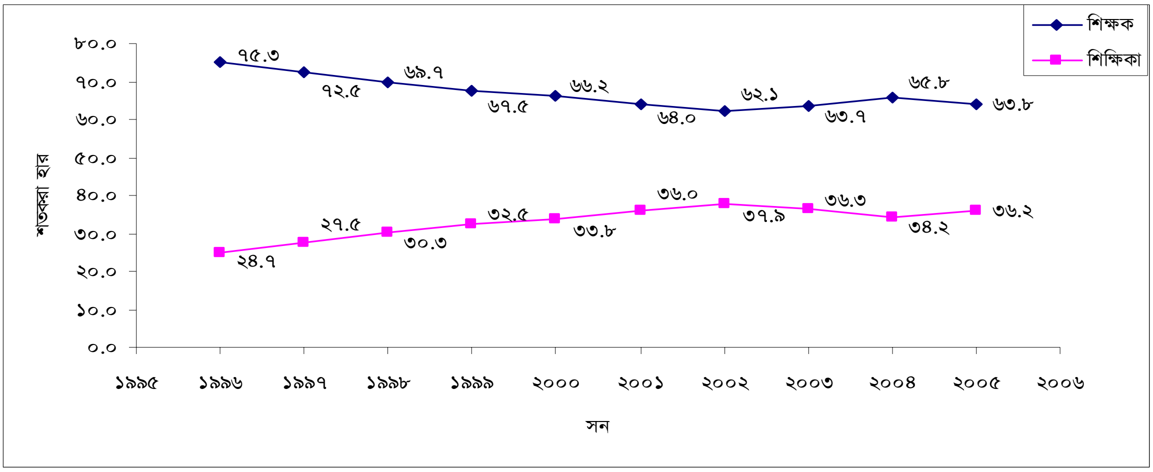

[Bangladesh Educational Statistics 2006, Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS), Dhaka]

১.৮.৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০০০ অনুযায়ী শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী ৪০ জন থাকার কথা। অন্যদিকে শিক্ষা অধিদপ্তর পিইডিপি-২ অনুযায়ী ২০০৯ সালের মধ্যে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী ৪৬ এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী ৫৯ জন, ১৯৯৬ সালে এই অনুপাত ছিলো ১:৭৩ (চিত্র ১.১০)।

চিত্র ১.১০: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী ১৯৯৬-২০০৫

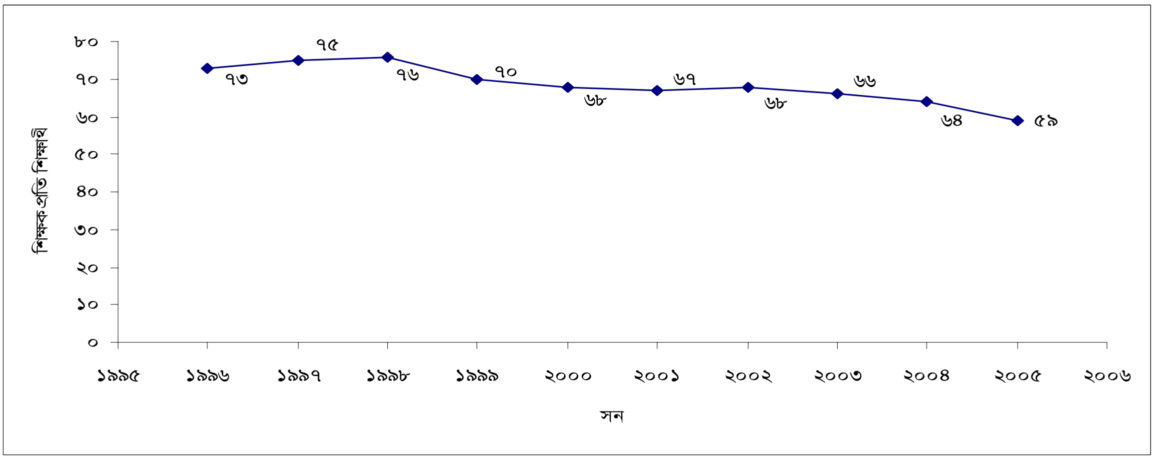

[Bangladesh Educational Statistics 2006, Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS), Dhaka]

১.৯ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষত্রে পরিমাণগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু গুণগত দিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। ২০০১ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান নামক একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পরেও ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক নির্ধারিত সবগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এর অর্থ হলো প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের কাছাকাছিও আসতে পারেনি।

অধ্যায় দুই
গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

২.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অনুঘটক হিসেবে ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। টিআইবি'র প্রত্যাশা এমন এক বাংলাদেশ যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন হবে দুর্নীতিমুক্ত। এই অভিপ্রায়ে টিআইবি বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন 'মেকিং ওয়েভস' প্রকল্পের আওতায় গবেষণা, অ্যাডভোকেসি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিক সম্পৃক্তকরণ প্রভৃতি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

টিআইবি প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ইতোপূর্বেই কাজ শুরু করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সেবা উন্নত করতে রিপোর্ট কার্ড জরিপের মাধ্যমে শিক্ষক ও স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কাজের অভিজ্ঞতায় টিআইবি লক্ষ করে যে প্রাথমিক শিক্ষা সেবা উন্নত করতে হলে শুধু স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করলে চলবে না, এর মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যে সকল সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে সেগুলো উদ্ঘাটন করে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে কাজ করতে হবে। তাছাড়া রিপোর্ট কার্ড[২৪] জরিপ হতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ চিত্র লাভ করা যায় না। ফলে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গভীর অনুসন্ধানমূলক একটি গবেষণা পরিচালনা করার চাহিদা রয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণার লক্ষ্য

গবেষণাটির লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষায় সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণ জনগণ ও কর্তৃপক্ষকে সচতন করার মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যাডভোকেসি'র মাধ্যমে এই খাতে বিরাজমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

গবেষণার উদ্দেশ্য

- প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যার ধরন নির্ণয় ও তার কারণ বিশ্লেষণ করা;
- প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রকৃতি অনুসন্ধান করা;
- প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

২.৩ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত তথ্য বিশ্লেষণমূলক (qualitative data analysis) গবেষণা। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ: প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, যেমন টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ড জরিপ (খানার সংখ্যা ৩,৮৯৮টি), গণসাক্ষরতা অভিযান এবং পিপিআরসি'র গবেষণা প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এ্যান্ড স্টাটিসটিকস প্রতিবেদন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বেইজলাইন জরিপ প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারের বাজেট প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বই ও প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

[২৪] রিপোর্ট কার্ড হলো কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মান যাচাই করার একটি কৌশল। এর মাধ্যমে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা কতটুকু ভালো বা কতটুকু খারাপ, সেই প্রতিষ্ঠান সেবাগ্রহণকারীদেরকে কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পারছে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানা যায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *রিপোর্ট কার্ড জরিপ: কী, কেন ও কিভাবে*, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

টিআইবি'র বেইজলাইন রিপোর্ট: ২০০৭ সালে টিআইবি ৩৫টি সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)[২৫] এলাকায় বেইজলাইন করার নিমিত্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মায়েদের সাথে ৩৫টি স্পোক অনুশীলন এবং শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সাথে ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে ৩৫টি করে এফজিডি সম্পাদন করেছে। এ সকল অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত তথ্য এ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

ওয়েব সাইট সার্চ: দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণার প্রত্যক্ষ তথ্যদাতা এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি নিজে বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন অথবা খুব কাছে থেকে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে গবেষণার তথ্যদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ কৌশল নিম্নরূপ:

ব্যক্তি পর্যায়ে নিবিড় সাক্ষাৎকার: ব্যক্তি পর্যায়ে ৫৯ জনের নিবিড় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুক্ত আলোচনা পদ্ধতিতে এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তি পর্যায়ের সাক্ষাৎকার দাতারা নিম্নরূপ:

উত্তরদাতাদের ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	২৩
শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি (উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি)	৬
উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	১০
জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৭
বিভাগ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	২
প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করছেন এমন ব্যক্তি ও এনজিও প্রতিনিধি	৭
স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য	২
অন্যান্য (উপবৃত্তি কর্মসূচী এবং এনসিটিবিটিতে কর্মরত কর্মকর্তা)	২
মোট	৫৯

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি): তথ্য সংগ্রহ করতে ২৯টি ছোট দলে আলোচনা করা হয়েছে। দলগুলোতে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ১৩১ জন। দলগুলোর বিভাজন নিম্নরূপ:

এফজিডি দলের পরিচিতি	এফজিডি সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	১	৫
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	১	৪
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	১১	৪৭
শিক্ষার্থীর অভিভাবক	১৬	৭৫
মোট	২৯	১৩১

কেস স্টাডি: এই গবেষণায় ভুক্তভোগীর সাথে কেস স্টাডির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন ও শিক্ষক এমপিওকরণ, বদলি ও পেনশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য কেস স্টাডি হতে পাওয়া গেছে। কেস স্টাডির ধরনসমূহ নিম্নরূপ:

কেস স্টাডির ধরন	কেস স্টাডির সংখ্যা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি	৫
সরকারি শিক্ষকদের পেনশনসংক্রান্ত জটিলতা	৬
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন	৩
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এমপিওকরণ	৩
মোট	১৭

২.৪ তথ্যদাতা নির্বাচন পদ্ধতি

গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করলে যারা সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হন তাদেরকেই তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। যেহেতু এটি একটি গুণগত তথ্য বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা সে কারণে গবেষণার তথ্যদাতা উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে।

[২৫] টিআইবি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সুশিল সমাজকে সচেতন নাগরিক কমিটির ব্যানারে সম্পৃক্ত করে কাজ করছে এবং এ যাবত দেশের বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলা শহরে ৩৬ সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) গড়ে তুলেছে। সচেতন নাগরিক কমিটিগুলো টিআইবি'র কাজের অংশীদার হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে চলছে।

২.৫ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই

তথ্য সংগ্রহকালেই তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই করা হয়েছে। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কমপক্ষে তিন জন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে যাচাই করা হয়েছে এবং প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বোপরি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের পর একটি জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান করে গবেষণার ফলাফলের উপর মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই করা হয়েছে।

২.৬ তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

এটি একটি গুণগত তথ্য বিশ্লেষণাত্মক (qualitative data analysis) গবেষণা। বেশিরভাগ তথ্যেরই বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে কিছু ক্ষেত্রে সংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করে টিআইবি'র গবেষণা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয় এবং তা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

২.৭ গবেষণাটির বিশেষত্ব

এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে। এখানে মতামত নির্ভর কোনো তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়নি। বেশির ভাগ তথ্যদাতাই কোনো না কোনো মাত্রায় সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য প্রদান করেছেন। এছাড়া কিছু তথ্যদাতা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে যে সকল সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি অবলোকন করেছেন তার আলোকে তথ্য প্রদান করেছেন।

২.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, বেসরকারি পর্যায় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসনের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তবে এই গবেষণায় বেসরকারি পর্যায় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশাসনের অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি।

২.৯ গবেষণা কাল

আগস্ট ২০০৭ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.১০ প্রতিবেদন কাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষার উপর পরিচালিত এই গবেষণা প্রতিবেদনটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত। এর প্রথম অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ধরন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কার্যাবলী ও জনবল, প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার স্বরূপ, স্বাধীনতার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ, প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট ও শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় এবং প্রাথমিক শিক্ষায় অর্জন ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। প্রতিবেদনের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার ও গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায় তিন
প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যার প্রকৃতি

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দরকার সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা বিদ্যমান। এই অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৩.১ শিক্ষকরা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে

প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষকরা নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করে থাকে। শিক্ষকদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো উদ্ঘাটন করা হয়েছে। নিম্নে এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৩.১.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা

শিক্ষক স্বল্পতা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনে সমস্যা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতি গড়ে শিক্ষক প্রায় ৪ জন এবং শিক্ষার্থী প্রায় ২২৩ জন। অর্থাৎ গড়ে এক এক জন শিক্ষককে প্রায় ৫৫ জন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থী ৫৯ জন, রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে ৪৭ জন এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়ে ৪৯ জন (সারণি ৩.১)।

সারণি ৩.১: সরকারি প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০০৫)

বিদ্যালয়ের ধরন	প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থী (জন)
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৯
বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯

[সূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী ২' *বেইজলাইন রিপোর্ট*, জুন ২০০৬]

আমাদের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, নেপালে প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থী ৩৯.৭১ জন, পাকিস্তানে ৩৮.৩৪ জন, মালদ্বীপে ২০.০৮ জন, ভুটানে ৩১.০৫ জন এবং ভারতে ৪২.০০ জন।[২৬] অর্থাৎ ঐ সকল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। তাছাড়া জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে গড়ে ৪ জন করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও অনেক বিদ্যালয়েই এর চেয়ে কম শিক্ষক রয়েছে। বর্তমানে পিটিআইগুলোতে ডবল ব্যাচে প্রশিক্ষণ চলছে ফলে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা এক/দুই জনে নেমে এসেছে। তাছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ার ফলে মাতৃত্বকালীন ছুটির পরিমাণও বেড়ে গেছে যা বিদ্যালয়গুলোতে আরো শিক্ষক সংকট তৈরি করছে। এফজিডি থেকে জানা যায়, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রতি প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করতে পারেনা। যার কারণে লেখাপড়ার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আনা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের নিমিত্তে ২০১০ সালের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪৬ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৪ শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত ১:৩০ এর জন্য সুপারিশ করেছে। বস্তুত শিক্ষা সেবা উন্নত করতে হলে শিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীর চাপ কমাতে হবে। এটা করার জন্য শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৪ এর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত ১:৩০ এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ হলো উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদীর ব্যবস্থা করা দরকার।

[২৬] www.nationmaster.com/red/graph/edu_pup_rat_pri-education-pupil-teacher-ratio-pri. (accessed on 9/01/2008),
* www.unicef.org/india/education_1551.htm (accessed on 4/05/2008).

৩.১.২ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা শিক্ষকদের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে (২০০৪ সাল) সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে[২৭] যা ২০০২ সালে ছিলো ৩২ শতাংশ। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে এফজিডি থেকে জানা যায়, ক্রমবর্ধমান হারে এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে এনজিও বিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, গ্রামের দরিদ্র মানুষের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, ফলে ছেলে-মেয়েরা পারিবারিক কাজে সহায়তা করে সুবিধামত সময়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষা সহজ হওয়ায় অনেক ছেলে-মেয়ে সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে চলে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার এবতেদায়ি শাখায় শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৬.৮৭ শতাংশ, অন্যদিকে ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭.৭১ শতাংশ।[২৮] তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ হলো দেশ ব্যাপী উপবৃত্তি কার্যক্রম। সরকার কতিপয় শর্ত[২৯] সাপেক্ষে দরিদ্র পরিবারের[৩০] ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করে থাকে। উপবৃত্তি পাওয়ার আশায় অধিক হারে ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়, কিন্তু শর্ত পূরণ করতে না পারার কারণে তাদের অনেকে উপবৃত্তির আওতায় আসতে পারে না, আবার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না থাকায় শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও সকলকে উপবৃত্তি দেওয়া সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় যারা উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয় তাদের কারো কারো অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়।

শিক্ষক ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে হলে বিদ্যালয়ের সময়সূচি স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করা উচিত এবং উপবৃত্তি কার্যক্রমের পরিবর্তে ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরকে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর ফলে শিক্ষাথীরা বিদ্যালয় মুখী হবে, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়বে এবং ঝরে পড়া রোধ হবে।

৩.১.৩ শ্রেণী কক্ষের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় শিক্ষার্থীর আধিক্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণী কক্ষের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণী পরিচালনা করতে হয়। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত বেইজলাইন সার্ভের ফলাফলে দেখা যায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ প্রতি ৬৮ জন এবং বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ প্রতি ৬৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলোতে এতগুলো শিক্ষার্থী বসানোর পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় শিক্ষার্থীদের বসতে খুবই কষ্ট হয়, দুই জনের জায়গায় ৩/4 জন করে বসতে হয়। শ্রেণীকক্ষগুলোতে ধারণ ক্ষমতার তুলনায় বেশী শিক্ষার্থী থাকায় শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ পড়াশুনার অনুকুল থাকে না। তাছাড়া শ্রেণীতে অনেক ছাত্রছাত্রী থাকায় প্রথম ক্লাসে তাদের হাজিরা যাচাই করতেই অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায়, ফলে প্রথম ক্লাসে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার জন্য কম সময় পায়।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর চাপ কমাতে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ কিছুটা হলেও উন্নত হবে। তবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যেগ গ্রহণ করা দরকার।

---

[২৭] '২০০৪ সালে গ্রেড ১ থেকে গ্রেড ৫ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ছিলো শতকরা ৪৮ ভাগ, সাম্প্রতিক প্রাথমিক শিক্ষার এমআইএস ডাটা থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।' প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদন '*হালখাতা*' পিপিআরসি, এপ্রিল, ২০০৮, পৃ. ৭৭।

[২৮] ১৯৯৬ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার এবতেদায়ি শাখায় শিক্ষার্থী ছিলো ১০,০৫,৬৬৬ জন যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ১৬,৭৮,১৭২ জনে উপনীত হয়। অন্যদিকে ১৯৯৬ সালে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ছিলো ১,৭৫,৮০,৪১৬ জন যা কমে ২০০৫ সালে ১,৬২,২৫,৬৫৮ জনে উপনীত হয় (Bangladesh Educational Statistics 2006, Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS), Dhaka)।

[২৯] উপবৃত্তি পাওয়ার আসার শর্তসমূহ হলোঃ ১) দরিদ্র পরিবারের শিশু হতে হবে, ২) ৮৫ শতাংশ পাঠদিবসে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। ৩) তালিকাভুক্ত (১ম শ্রেণী ব্যতীত) ছাত্র-ছাত্রীর বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। (বিস্তারিত জানতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত উপবৃত্তির সংশোধিত পরিপত্র যার স্মারক নং প্রাগম/পরি-২/৩০/২০০৬/৩৯৩, তারিখ ২৬/০৭/২০০৬ দেখুন)

[৩০] (ক) দুস্থ বিধবা নারীর পরিবার (খ) দিনমজুর (গ) অসচ্ছল পেশাজীবী, যেমন- জেলে, কুমার, কামার, তাঁতী, মুচী (ঘ) ভূমিহীন/০.৫০ শতাংশ জমির মালিক। (বিস্তারিত জানতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত উপবৃত্তির সংশোধিত পরিপত্র যার স্মারক নং প্রাগম/পরি-২/৩০/২০০৬/৩৯৩, তারিখ ২৬/০৭/২০০৬ দেখুন)

৩.১.৪ শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার অভাব

গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়ভিক্তিক দক্ষ শিক্ষকের বেশ অভাব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এ যাবত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৭ শতাংশ এবং বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০ শতাংশ শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।[৩১] অর্থাৎ এখনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৩ শতাংশ এবং বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশ শিক্ষক বিষয়ভিক্তিক প্রশিক্ষণ পান নি।

এফজিডি থেকে জানা যায়, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে কোনো শিক্ষক ইতিপূর্বে কোন একটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাকে আবার অন্য একটি বিষযের উপর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হচ্ছে। অবশ্য এব পেছনে কারণ রয়েছে তা হলো বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এক শিক্ষককে একাধিক বিষয় পড়াতে হয়, সে কারণে অনেক শিক্ষককে একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। অন্যদিকে একই শিক্ষককে একাধিক বিষয় পড়াতে হয় বলে কোনো একটি বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ তাদের থাকে না।

মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষক গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে প্রতি বিষয়ের উপর একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ করে তুলতে হবে।

৩.১.৫ শিক্ষকদের দূরদূরান্ত থেকে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে শিক্ষক হওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের যথেষ্ট অভাব লক্ষ করা যায়। শিক্ষক নিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাধারণত শহরের (উপজেলা সদর) লোকেরাই বেশি নিয়োগ পেয়ে থাকে। কিন্তু নিজ এলাকার বিদ্যালয়ে পদ ফাঁকা না থাকলে তাদেরকে একই উপজেলার মধ্যে অন্য এলাকার কোনো বিদ্যালয়ে পোস্টিং দেওয়া হয়। শিক্ষকরা নিজ বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন, কিন্তু বিদ্যালয় বাড়ি থেকে দূরে থাকায় তারা প্রায়ই বিলম্ব করে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, আবার ছুটির আগেই বিদ্যালয় থেকে চলে যায়। বিশেষকরে নারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এমনটি বেশি ঘটে থাকে। মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে এফজিডি থেকে জানা যায়, শিক্ষকদের বিশেষকরে নারী শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে বিলম্বে উপস্থিতি এবং আগে চলে আসার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও তারা মানবিক কারণে উপক্ষো করে চলেন। কারণ সামাজিক বাস্তবতায় দেখা যায় চাকুরীজীবী নারীদেরকে এখনো গৃহস্থালী নানা কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হয়, তাদেরকে সুযোগ না দিলে তারা চাকুরী করতে উৎসাহিত হবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে পোস্টিং দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজ এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো নিজ এলাকায় খুব কদাচিৎ পদ ফাঁকা পাওয়া যায়। এ সমস্যা কিছুটা লাঘব করার জন্য শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে ইউনিয়নভিত্তিক কোটা করে সেই ইউনিয়নের প্রার্থীদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে ঐ ইউনিয়নের মধ্য থেকে প্রার্থী পাওয়া না গেলে নিকটতম ইউনিয়ন থেকে নেওয়া যেতে পারে।

৩.১.৬ শিক্ষকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শুধু পাঠদানই করে থাকেন না, তাদেরকে বিভিন্ন রকমের কাজও সম্পাদন করতে হয়। এফজিডি থেকে জানা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে প্রায় ৭৩টির[৩২] মত কাজ করতে হয়। এ কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ১) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী, ২) প্রশাসনিক কার্যবলী, ৩) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী, ৪) শিক্ষা সহায়ক কার্যাবলী, ৫) সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং ৬) শিক্ষা বহির্ভূত রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী। এত সব কাজ করতে গিয়ে আসলে কোনো কাজই যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না। বরং পাঠদান প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা থাকার কারণে কর্মরত শিক্ষকদের উপর কাজের চাপ আরো বেশি। তারা এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য তার নিজের যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার অনেকেই তা নিতে পারেন না। নিয়ম আছে পাঠটিকা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে পড়াতে হবে, কিন্তু অনেক সময় তারা পাঠটিকা তৈরি করার সময় সময় বের করতে পারেন না। তাছাড়া কাজের মানসিক চাপে পাঠদান আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন না।

শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন করতে হলে ও শিক্ষার মান বাড়াতে হলে শিক্ষকদের উপর থেকে কাজের চাপ কমাতে হবে। বিশেষকরে শিক্ষা বহির্ভূত রাষ্ট্রীয় কাজে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা বন্ধ করতে হবে।

---

[৩১] প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী ২' *বেইজলাইন রিপোর্ট*, জুন ২০০৬।

[৩২] শিক্ষকদের কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

৩.১.৭ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থের স্বল্পতা

প্রতিটি বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন রকমের আনুষঙ্গিক ব্যয় রয়েছে। অথচ এই ব্যয় বহনের জন্য সরকার খুবই সামান্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। যেমন প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কন্টিনজেন্সি খাতে বছরে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩০০০-৪২০০ টাকা, প্রতিটি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩০০০ টাকা এবং প্রতিটি কমিউনিটি বিদ্যালয়ে বছরে বরাদ্দ দেওয়া হয় ৩৬০ টাকা। এই সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে কোনো ক্রমেই বিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমতাবস্থায় অনেক সময় শিক্ষকরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে ফি বা চাঁদা নিতে বাধ্য হয়, আবার অনেক সময় তারা নিজেরাও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। গবেষণায় শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোনো সরকারি বা রেজিস্টার্ড বা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ৬,৮৫০ টাকা থেকে ১০,৬০০ টাকা বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২: প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ

ক্র.নং	বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সাধারণ ব্যয়ের খাত	বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ
০১.	স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভা (প্রতি মাসে একটি করে)	১২০০-১৫০০ টাকা
০২.	অভিভাবক সভা আয়োজন	৭০০-১০০০ টাকা
০৩.	মা সমাবেশ অনুষ্ঠান (বছরে ২-৩টি)	১০০০-১৫০০ টাকা
০৪.	বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন (একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, প্রভৃতি)	৫০০-৬০০ টাকা
০৫.	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিদ্যালয় পরিদর্শনকালীন আপ্যায়ন	১৫০-২০০ টাকা
০৬.	বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার করানো	৪০০-৮০০ টাকা
০৭.	বিভিন্ন প্রকারের ফটোকপি[৩৩]	৯০০-১০০০ টাকা
০৮.	চক, ডাস্টার, কাগজ, কলম, হাজিরা খাতা, রেজিস্টার খাতা প্রভৃতি	২০০০-৪০০০ টাকা
	গড়ে মোট =	৬৮৫০-১০৬০০ টাকা

[সূত্রঃ শিক্ষকদের সাথে এফজিডি ও নিবিড় সাক্ষাৎকার]

এফজিডি থেকে জানা যায়, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে বিদ্যালয়ের অনেক কাজই সুন্দরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। প্রতি মাসে একটি করে ম্যানেজিং কমিটির সভা আয়োজন করতে গেলে তাদের জন্য অন্তত একটু চা-নাস্তার ব্যবস্থা করতে হয়। এটা করতে গেলে সবসময়ই শিক্ষকদের পকেট থেকে টাকা গুনতে হয়। কিন্তু তা সব সময় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা, এ কারণে কার্যকরভাবে ম্যানেজিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। বছরে কমপক্ষে দুটি শিক্ষক অভিভাবক সভা অনুষ্ঠান করার কথা রয়েছে অর্থাভাবে এ কাজটিও যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষক-অভিভাবক সভা অনুষ্ঠান করা গেলে খুবই সুফল পাওয়া যেত। বছরে ২-৩টি মা সমাবেশ অনুষ্ঠান করার কথা তা-ও যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করা যায় না। সাধারণত উপবৃত্তি বিতরণ কালে মায়েরা সমবেত হয়, সেগুলোকেই মা সমাবেশ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। আসলে এ থেকে মা সমাবেশের উদ্দেশ্য অর্জন হয় না। এনজিওরা কোনো কার্যক্রম বাস্তায়ন করলে সেখানে রিফ্রেসমেন্টের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু শিক্ষরা উঠান বৈঠক করতে গেলে সেখানে কোনো রিফ্রেসমেন্টের ব্যবস্থা থাকেনা, ফলে অভিভাবকদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে টয়লেট রয়েছে, অর্থাভাবে এগুলো নিয়মিত পরিস্কার করানো যায়না বলে তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন দিবস যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, প্রভৃতি উদযাপনের নির্দেশ রয়েছে। এই দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শিশুরা দেশপ্রেম অর্জন করবে। এসকল দিবস পালন করতে গেলে কম বেশি অর্থ দরকার হয়, কিন্তু অর্থাভাবে তা-ও করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন ছড়া, গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি, খেলাধুলা প্রভৃতি আয়োজনের জন্যও কিছু অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে।

যে সকল কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হলো এর প্রতিটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থের দরকার রয়েছে, কিন্তু এ জন্য সরকার থেকে কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয় না, আবার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এগুলো অনুষ্ঠানের জন্য কোনো ফি বা চাঁদা নেওয়ার নিয়ম নেই সে কারণে উল্লিখিত কাজগুলোর কোনোটিই সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক এবং কল্যাণ সমিতির সদস্যরা যদি যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতো তাহলে এ কাজগুলো করা সহজ হয়ে যেতো। শহর এলাকার কিছু কিছু বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা বেশ সচেতন, তারা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সহায়তার হাত নিয়ে এগিয়ে আসে এবং শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে ফি বা চাঁদা নিয়ে এ সকল কাজ বাস্তবায়ন করে থাকেন, ফলে সে সকল বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান ভালো এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশও উন্নত। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের লোকজন অসচেতন ও দরিদ্র, ফলে তারা এ সকল কাজে সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে আসেন না।

[৩৩] বিভিন্ন প্রকারের ফটোকপির বার্ষিক আনুমানিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট ১০ দেখুন।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সুন্দর ও সার্থক করতে হলে উল্লিখিত সমস্যাগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং এ জন্য সরকার থেকে অর্থের বরাদ্দ দিতে হবে নতুবা অভিভাবকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিছু কিছু খাতে ফি নেওয়ার নিয়ম করতে হবে।

৩.১.৮ ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি ও কল্যাণ সমিতির কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতার অভাব

বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি ও কল্যাণ সমিতি রয়েছে। শিক্ষকদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা দেখা এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে শিক্ষকদের সহায়তা করা তাদের মূল দায়িত্ব। কিন্তু শিক্ষকরা এ সকল কমিটির কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহায়তা পান না। শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে এফজিডি থেকে ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি ও কল্যাণ সমিতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায়:

ম্যানেজিং কমিটি

বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কার্যাবলী মনিটরিং, শিক্ষক-ছাত্রের উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্যপরায়ণতা, পাঠদান তদারকি এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির উপর অর্পিত।[৩৪] কিন্তু বেশিরভাগ ম্যানেজিং কমিটির চিত্র নিম্নরূপ:

- বেশিরভাগ ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় থাকেন।
- বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদেরকে পাওয়া যায় না।
- প্রতি মাসে একটি করে মিটিং হওয়ার কথা থাকলেও তা হয় না।
- অফিসিয়াল ডক্যুমেন্ট হিসেবে সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মিটিং হয়েছে এরূপ রেজলুশন প্রস্তুত করে রাখা হয়।
- ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে রেজলুশন খাতায় স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আনতে হয়।

শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি

স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা, জবাবদিহিতা, সামাজিক সম্পৃক্ততা ইত্যাদির সাথে শিক্ষক-অভিভাবকদেরকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী' সফলভাবে বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়কে একটি শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই হলো শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির লক্ষ্য।[৩৫] কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ সমিতির চিত্র নিম্নরূপ:

- এই সমিতির উপস্থিতি শুধুমাত্র কাগজে-কলমে।
- সমিতির জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সমিতি পালন করছে না।
- এ সমিতি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় একটি প্রতিষ্ঠান।

কল্যাণ সমিতি

স্থানীয় পর্যায় থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও গরীব শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সহায়তা করা এই সমিতির লক্ষ্য।[৩৬] কিন্তু বেশিরভাগ সমিতির অবস্থা নিম্নরূপ:

- এটি একটি কাগুজে সমিতি বৈ অন্য কিছু নয়।
- বাস্তবে এই সমিতির কোনো উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না।
- এই সমিতির কোনো কার্যক্রমই নেই।
- অর্থাভাবে অনেক সমিতি সমাজ সেবা অফিস থেকে নিবন্ধন নিতে পারছে না।

ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি ও কল্যাণ সমিতি এগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করলে প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা খুবই সহজ হতো। কিন্তু যেহেতু এগুলো সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত, এখানে কোনো আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নেই, সে কারণে এগুলো সক্রিয় হচ্ছে না। তাছাড়া এ কমিটিগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও কোনো ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও কোনো কোনো সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা কিছু দিন সক্রিয় থাকে, পরে ধীরে ধীরে আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

এই কমিটিগুলো কার্যকর রাখতে হলে সদস্যদেরকে একবার প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দিলে হবেনা, তাদেরকে মাঝে মাঝে ফলোআপ প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

---

[৩৪] ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

[৩৫] শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গঠন সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

[৩৬] কল্যাণ সমিতির লক্ষ্য ও গঠন সম্পর্কে জানতে পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

৩.১.৯ নারী শিক্ষকদের প্রতি কমিউনিটি ও ম্যানেজিং কমিটির নেতিবাচক মনোভাব

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০ শতাংশ শিক্ষক থাকবে- নারী। এই লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের বর্তমান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় এখনো নারী শিক্ষকদের প্রতি বিরূপ ধারণা রয়েছে। এমনকি অনেক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরাও নারী শিক্ষককে সাদরে মেনে নিতে পারেন না। নারী শিক্ষক সম্পর্কে তাদের ধারণা নিম্নরূপ:

- নারী শিক্ষকরা সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসে না।
- তারা বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার আগেই চলে যায়।
- নারী শিক্ষকরা বেশি বেশি ছুটি নেয়।
- পারিবারিক কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ততা বেশি থাকায় তারা পাঠদানের প্রতি কম মনোযোগী থাকে।
- পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে বিদ্যালয়ে এসে অন্য শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে সময় নষ্ট করে।

বক্স- ১: নারী শিক্ষকের প্রতি ম্যানেজিং কমিটির নেতিবাচক ধারণা সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি

মোছাম্মৎ জেসমিন আরা (ছদ্ম নাম)। একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। পূর্বে তিনি অন্য একটি বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। বিদ্যালয়টি তার বাড়ি থেকে দূরে থাকায় যাতায়াতে বেশ সমস্যা ছিল। কিছুদিন আগে তার বাড়ির কাছের একটি বিদ্যালয়ে পদ শূন্য হলে সেখানে বদলি হয়ে আসার জন্য তিনি আবেদন করেন। তিনি যে বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেই বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছুটে যান উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। কোনো নারী শিক্ষককে তার বিদ্যালয়ে বদলি না করার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। এই গবেষণার অংশ হিসেবে মোছাম্মৎ জেসমিন আরা এর সাক্ষাতথ্যর গ্রহণকালে ম্যানেজিং কমিটির উক্ত সভাপতিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক নিতে অনাগ্রহের কারণ হিসেবে বলেন "নারী শিক্ষকদের পরিবারের কাজ শেষ করে বিদ্যালয়ে আসতে হয় বিধায় তারা প্রায়শই দেরি করে বিদ্যালয়ে আসেন, তারা পুরুষদের তুলনায় বেশি ছুটি নেন।" এমতাবস্থায় জেসমিন আরা তার পছন্দের বিদ্যালয়ে আসার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জোর তদবির করতে থাকেন। সর্বোপরি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে তার পছন্দমত বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসতে সক্ষম হন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে ৬০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিয়োগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে সেই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে এবং নারী শিক্ষকদের কাছ থেকে সুফল পেতে তাদের প্রতি কমিউনিটি এবং ম্যানেজিং কমিটির যে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে তা করা অতীব জরুরি। এটি করার জন্য পুরুষ শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জেন্ডার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন দেওয়া যেতে পারে।

৩.১.১০ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে শিক্ষকের হয়রানি

প্রাথমিক শিক্ষকদের সকল প্রশাসনিক কাজ করতে হয় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। টাইম স্কেল, ইবি ক্রস, সার্টিফিকেট সংযুক্তিকরণ, ছুটি, পেনশন প্রভৃতি কাজে তাদেরকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। কিন্তু উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে গিয়ে তারা কোনো কাজই সহজভাবে করাতে পারে না। তারা কোনো কাগজপত্র জমা দিলে তা দিনের পর দিন করণিকের টেবিলে পড়ে থাকে। কাজের অগ্রগতির জন্য তাদেরকে বার বার করণিকের কাছে ধরণা দিতে হয়, অনেক সময় করণিকরা কাগজপত্র হারিয়ে ফেলে, তাদের পূণরায় কাগজপত্র সংগ্রহ করে দিতে হয়, অনেক সময় করণিকরা শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিষয়গুলো অবহিত করলেও কোনো লাভ হয় না, বরং করণিক কর্তৃক হয়রানি আরো বেড়ে যায়।

কাজের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে ঘুরাঘুরি করতে শিক্ষকদের অনেক সময় নষ্ট হয়, ফলে পাঠদান ব্যাহত হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিসে শিক্ষকের হয়রানি বন্ধ করতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে আরো উদ্যোগী হতে হবে, উপজেলা শিক্ষা অফিস শিক্ষকদের কোন কাজ কত দিনে করে দিবে তার তালিকা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১.১১ শিক্ষকদের বেতন-ভাতার স্বল্পতা

শিক্ষকদের বেতন-ভাতার স্বল্পতা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সমস্যা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরীতে যোগদানের পর শুরুতে সহকারী শিক্ষকের মাসিক মূল বেতন ধরা হয় ৩,০০০ টাকা এবং প্রধান শিক্ষকের মাসিক মূল বেতন ধরা হয় ৩,৩০০ টাকা, এর সাথে মূল বেতনের ৪৫-৬০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া এবং ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা। বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতন দেওয়া হয় ২,৫৫০ টাকা (সরকারি শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮৫ শতাংশ)[৩৭], বাড়ি ভাড়া ২০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ২০০ টাকা। বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের জন্য কোনো পদ বরাদ্দ নেই, শিক্ষকদের মধ্য থেকে এক জন দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং তাকে ৫০ টাকা দায়িত্ব ভাতা দেওয়া হয়। সবচেয়ে কম আর্থিক সুবিধা পায় কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, তাদের মাসিক থোক ১,২০০ টাকা সম্মানী দেওয়া হয় (সারণি ৩.৩)।

সারণি ৩.৩: সরকারি, রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা (টাকা)

বিদ্যালয়ের ধরন		মূল বেতন (মাসিক)	বাড়ি ভাড়া[৩৮] (মাসিক)	চিকিৎসা ভাতা (মাসিক)	প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভাতা	মোট (মাসিক)
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক	৩,৩০০	১,৪৮৫-১,৯৮০	৫০০	-	৫,২৮৫-৫,৭৮০
	সহকারী শিক্ষক	৩,০০০	১,৪০০-১৮০০	৫০০	-	৪,৯০০-৫,৩০০
বেসরকারি রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়[৩৯]	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	২,৫৫০	২০০	২০০	৫০	৩,০০০
	সহকারী শিক্ষক	২,৫৫০	২০০	২০০	-	২,৯৫০
কমিউনিটি বিদ্যালয়	সহকারী শিক্ষক	১,২০০	-	-	-	১,২০০

পিটিআই প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর সহকারী শিক্ষকের মূল বেতন নির্ধারিত হয় ৩,১০০ টাকা এবং প্রধান শিক্ষকের মূল বেতন নির্ধারিত হয় ৩,৫০০ টাকা এবং অন্যান্য সযোগ-সুবিধা একই অনুপাতে প্রদান করা হয়। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন চাকুরীর বয়সের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। চাকুরীর বয়স ৩-৫ বছরের মধ্যে হলে তাদের দেওয়া হয় সরকারি শিক্ষকদের মূল বেতনের ৯০ শতাংশ এবং চাকুরীর বয়স পাঁচ বছরের বেশি হলে তাদের দেওয়া হয় সরকারি শিক্ষকদের মূল বেতনের ৯৫ শতাংশ।

শিক্ষকদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং নিবিড় সাক্ষাৎকার হতে জানা যায় যে, বেতন-ভাতার স্বল্পতার কারণে জীবন জীবিকা নির্বাহের তাগিদে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্যকোনো আয়মূলক কাজে বিশেষ করে কৃষিকাজ ও প্রাইভেট টিউশনির সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। ফলে শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষক হিসেবে তার নিজের যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তা তারা নিতে ব্যর্থ হয় যার প্রভাব পড়ে পাঠ দানের ক্ষেত্রে। তবে অনেক শিক্ষক আছেন যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তাদের এ সমস্যা নেই এবং তারা ভালোভাবেই পাঠদান করে থাকেন। বর্তমান সময়ে চাকুরীর দুস্প্রাপ্যতার কারণে অনেক মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষার্থী ব্যক্তিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ নিয়ে আসেন। কিন্তু বেতন ভাতার স্বল্পতার কারণে তারা এ পেশায় তেমন মনোযোগ দিতে পারেন না। সর্বদা তারা পেশা ত্যাগ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন এবং সুযোগ পেলেই এ পেশা ত্যাগ করে চলে যান। সরকারি, রেজিস্টার্ড এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান- এ বিষয়টিও রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মারাত্মকভাবে আহত করে। নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, বেতন বৈষম্যের কারণে সরকারি বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক তাদেরকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ভেবে থাকে। এটা তাদেরকে মানসিকভাবে আক্রান্ত করে।

প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শিক্ষকদের হতাশা করতে হবে, যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের জীবন জীবীকা নির্বাহের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে এবং মেধাবী লোকদেরকে এই পেশায় আসার জন্য উৎসাহীত করতে হবে। এটি

[৩৭] রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীর শুরুতে বেতন দেওয়া হয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮৫ শতাংশ, চাকুরীর বয়স ৩ বছর পর্যন্ত তারা এই নিয়মে বেতন পান। চাকুরীর বয়স ৩-৫ বছরের মধ্যে থাকা অবস্থায় তারা বেতন পান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের ৯০ শতাংশ এবং চাকুরীর বয়স ৫ বছর অতিক্রম করলে তাদের বেতন দেওয়া হয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের ৯৫ শতাংশ, (জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম)।

[৩৮] বাড়িভাড়া: ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মূল বেতনের ৬০%, তবে ন্যূনতম ১,৮২০ টাকা। নারায়নগঞ্জ, টঙ্গী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশাল এর মেট্রোপলিটন বা পৌর এলাকার জন্য মূল বেতনের ৫০%, তবে ন্যূনতম ১,৫৪০ টাকা। তাছাড়া অন্যান্য এলাকার জন্য মূল বেতনের ৪৫%, তবে ন্যূনতম ১,৪০০ টাকা। (বাংলাদেশ গেজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ বঙ্গাব্দ/ ২৮ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ)।

[৩৯] রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীর বয়স ৩ বছরের কম তাদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮৫ শতাংশ, ৩-৫ বছরের মধ্যে হলে ৯০ শতাংশ এবং ৫ বছরের বেশি হরে ৯৫ শতাংশ বেতন সরকার থেকে প্রদান করা হয়, (জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম)।

করার জন্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতা পূর্নমূল্যায়ন করা দরকার। পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তা করার উদ্যেগ নিতে হবে।

৩.১.১২ শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগের অভাব

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ খুবই সীমিত। দুইটি কারণে এই সমস্যাটি তৈরি হয়। প্রথমত এখানে শিক্ষকদের পদক্রম মাত্র দু'টি, যথা সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক। দ্বিতীয়ত প্রধান শিক্ষকের পদের ৩৫ শতাংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয় এবং বাকি ৬৫ শতাংশ পদ সহকারী শিক্ষক থেকে পদোন্নতির[৪০] মাধ্যমে পূরণ করা হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতি ৫ জন সহকারী শিক্ষক থেকে মাত্র এক জন পদোন্নতি পায় এবং চার জনকে একই পদে চাকুরী করে অবসর নিতে হয়। অন্যদিকে যে ৩৫ শতাংশকে প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয় তাদেরও পদোন্নতির সুযোগ থাকে না।

একই পদে দীর্ঘ দিন চাকুরী করার ফলে শিক্ষকদের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পায়। শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে এফজিডি থেকে জানা যায় নতুনদের তুলনায় প্রবীণ শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আগ্রহের অভাব রয়েছে। এফজিডি ও মুখ্য নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে শিক্ষকরা জানান আসলে দীর্ঘ দিন একই পদে থেকে তাদের আগ্রহগুলো কমে যায়, পদোন্নতির সুযোগ থাকলে তাদের মধ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা ভালোভাবে পাঠদান করতে সক্ষম হবেন।

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে শিক্ষকদেরকে উজ্জীবীত করতে হবে। আর এটা করার জন্য তাদের পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করার জন্য বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের পদক্রম বাড়ানো যেতে পারে, যেমন সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক। পাশাপাশি সরাসরি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ না দিয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দিয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পদগুলো পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.১.১৩ সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে নারী ও পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা

পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে এগিয়ে আনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং পুরুষদের জন্য স্নাতক নির্ধারিত রয়েছে। শিক্ষকদের সাথে এফজিডি এবং নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় এই ব্যবস্থা অনেক পুরুষ শিক্ষকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তারা এ নিয়ম তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনে করেন। তাদের মতে নারীদের জন্য ৬০ শতাংশ কোটা নির্ধারণ রয়েছে, সেই কোটা থেকেই তারা শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া বর্তমানে নারী শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে, কাজেই বর্তমান সময়ে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যৌক্তিক নয়। তাদের মতে পুরুষের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুটা শিথিল করে নারী-ও পুরুষের জন্য একই শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হলে কারো মধ্যে কোনো ক্ষোভ থাকেনা। তাছাড়া নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি পাশ নির্ধারিত থাকলেও খুব কম সংখ্যক এসএসসি পাশ নারীই চাকুরী পায়, সাধারণত এইচএসসি পাশ নারীরাই বেশি চাকুরী পাচ্ছে। ২০০২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়েছেন এরূপ ১৭১ জন নারী শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসন্ধান করে নিম্নের চিত্র পাওয়া গেছে:

এস.এস.সি. পাশ	এইচ.এস.সি পাশ	স্নাতক ও তদুর্ধ
২৬ জন (১৫.২%)	১৩৬ জন (৭৯.৫%)	৯ জন (৫.৩%)

[তথ্য উৎস: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মেহেরপুর]

এই বিষয়ের উপর নারী শিক্ষকের মতামত যাচাই করে দুই রকমের মতামত পাওয়া গেছে। অনেক নারী শিক্ষক মনে করেন এখনো শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান করে দেওয়ার সময় আসেনি। কেননা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্থানীয় পর্যায় থেকে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার নীতি রয়েছে, কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা খুবই কম। কাজেই শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানো হলে গ্রামের নারীরা চাকুরী পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে এবং এর প্রভাব পড়বে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। গ্রাম থেকে নারী শিক্ষক পাওয়া না গেলে শহর থেকে বিশেষকরে উপজেলা সদর থেকে নারীদেরকে নিয়োগ দিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সোয়া চারটা পর্যন্ত ক্লাস চলে, দূর থেকে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হলে এই সময় সূচি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। অন্যদিকে অনেক নারী শিক্ষক মনে করেন শিক্ষক হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষভেদে ভিন্নতা রাখার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় অন্যরা অনেক সময় নারী শিক্ষকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, পাশাপাশি তিনিও কখনো কখনো

[৪০] সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পাওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা হলো সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশনসহ কমপক্ষে এইচএসসি পাশ এবং এর সাথে আট বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, (জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম)।

নিজেকে দুর্বল ভাবেন। এই বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন এমন ব্যক্তি ও জেন্ডার বিষয়ক বিশেষজ্ঞদেরও মতামত নেওয়া হয়েছে। তাদের মতে দুই দিকেই যুক্তি রয়েছে, তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান করে দেওয়ার সময় এখনো আসেনি। এখন যেটা করা দরকার তাহলো শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা। অর্থাৎ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের বেতন স্কেল বেশি হবে, তদ্রুপ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের তুলনায় স্নাতক পাশের বেতন স্কেল বেশি হবে। ফলে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হবে; প্রথমত যিনি বর্তমানে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশ শিক্ষক তিনি আরো বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে সচেষ্ট হবেন, দ্বিতীয়ত যারা স্নাতক পাশ হয়েও মাধ্যমিক শ্রেণী পাশ শিক্ষকের সমান বেতন পাচ্ছেন তাদের মনের অসন্তোষ নিবৃত হবে।

৩.১.১৪ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি পর্যাপ্ত নয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরে তিনটি করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যথা প্রথম সাময়িক পরীক্ষা, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত হারে ফি নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই ফি'র পরিমাণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৫ টাকা এবং তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ১০ টাকা। ফি থেকে শিক্ষার্থী প্রতি ৩ টাকা করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জমা দিতে হয়, এই টাকা দিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে বিদ্যালয়গুলোতে দেওয়া হয়। বাকি টাকা দিয়ে পরীক্ষার জন্য কাগজপত্র ক্রয় করে পরীক্ষা অনুষ্ঠান করতে হয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যাতায়াত এবং কাগজপত্র ক্রয় করার জন্য যাতায়াত খরচ হয়ে থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু দরিদ্র শিক্ষার্থী পরীক্ষা ফি দিতে সক্ষম হয় না, তাদেরকেও এই খরচের মধ্য থেকে পরীক্ষা দেওয়াতে হয়। সব মিলিয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য যে খরচ হয়, পরীক্ষার ফি থেকে সংগ্রহীত অর্থ দিয়ে তা সংকুলান করা সম্ভব হয় না, সে কারণে অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি ফি নেওয়া হয়ে থাকে।

পরীক্ষা ফি'র এই হার নির্ধারণ করা হয় ২০০৫ সালে। তখনকার জন্য এই পরিমাণ যথেষ্ট হলেও বর্তমান বাজার মূল্যে তা যথেষ্ট নয়। কাজেই এখন পরীক্ষা ফি'র হার পূণর্মূল্যায়ন করা দরকার।

৩.১.১৫ উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বিদ্যালয়ে বই পরিবহণ খরচ বিদ্যালয়ের দূরত্ব অনুযায়ী প্রদান না করা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে কেউ যাতে বঞ্চিত না হয় এ জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সরকার থেকে বিনামূল্যে বই দেওয়া হয়ে থাকে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে বিদ্যালয়গুলো বই সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করে থাকে। উপজেলা অফিস থেকে বিদ্যালয়ে বই নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়কে থোক ২০০ টাকা করে পরিবহণ ভাড়া দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলা অফিস থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব বিচার করা হয় না। তাছাড়া একত্রে সব বই পাওয়া যায় না, একাধিক বার বইয়ের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসতে হয়।

সকল দিক বিবেচনায় দেখা যায়, বই পরিবহণের জন্য যে ২০০ টাকা দেওয়া হয় তা দিয়ে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের পক্ষে পরিবহণ ভাড়া মেটানো সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১০-২০ টাকা করে পরিবহণ খরচ বাবদ চাঁদা নিয়ে থাকে। এই টাকার সবই যে পরিবহণ খাতে ব্যয় হয় তা নয়। অতিরিক্ত টাকা দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানো হয়। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বই দিয়ে কোনো টাকা নেওয়ার নিয়ম নেই, অথচ নীতিগত ক্রটির কারণে শিক্ষকরা এই অনিয়ম করতে বাধ্য হয়।

যে কোনো বরাদ্দের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা খুবই জরুরী, তা-না হলে এর সুফল সকলের কাছে পৌঁছায় না। উপজেলা অফিস থেকে বিদ্যালয়ে বই নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল বিদ্যালয়কে সমান থোক বরাদ্দ দেওয়ার ফলে, কাছের বিদ্যালয়গুলোর খরচ বেঁচে যাচ্ছে আবার দূরের বিদ্যালয়গুলো উল্লিখিত টাকা দিয়ে খরচ সংকুলান করতে পারছে না। এর ফলে দুইভাবে অনিয়ম হচ্ছে, প্রথমত কাছের বিদ্যালয়গুলো বেঁচে যাওয়া টাকা ফেরত দিচ্ছে না, দ্বিতীয়ত দূরের বিদ্যালয়গুলো ব্যয় সংকুলানের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। কাজেই স্বচ্ছতার জন্য ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য যে বিদ্যালয়ের যতটুকু খরচ হয় সেই বিদ্যালয়কে ততটুকু খরচ প্রদান করা উচিত।

৩.১.১৬ প্রধান শিক্ষকের উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াতের জন্য ভাতা না থাকা

বিদ্যালয়ে যাবতীয় প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব পালন করে থাকেন প্রধান শিক্ষক। অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজে মাসে তাকে কমপক্ষে ৩/৪ কর্ম দিবস উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াত করতে হয়। অথচ এজন্য তাকে কোনো প্রকার ভাতা প্রদান করা হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এমনিতেই খুব কম তার ওপর যদি প্রধান শিক্ষককে তার বেতনের টাকা দিয়ে অফিসিয়াল কাজের ব্যয় বহন করতে হয়, তাহলে তা মোটেই সুব্যবস্থা নয়। এরূপ ব্যবস্থা শিক্ষকের মানসিক অবস্থার উপর পেশা সম্পর্কে নেতিবাচক চাপ ফেলতে পারে যা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর। শিক্ষকরা মনে করেন অফিসিয়াল কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াতের জন্য প্রধান শিক্ষকের যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৩.২ মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করে

মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা নানাবিধ সমস্যার মধ্যে থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের সমস্যাগুলো উদ্ঘাটন করা হয়েছে। নিম্নে এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

৩.২.১ প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের পদে মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তার অভাব

সহকারী পরিচালক, উপ পরিচালক, পরিচালক এবং মহাপরিচালক এই পদগুলোতে যারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন তারাই প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণের জন্য কাজ করে থাকেন। এরূপ পদের সংখ্যা মোট ৩৭টি।[৪১] মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে এফজিডি থেকে জানা যায়, যারা এই পদগুলোতে বর্তমান রয়েছেন মাঠ পর্যায়ে কাজ করার তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বিসিএস প্রশাসন বা বিসিএস শিক্ষায় যারা নিয়োগ পেয়ে অন্যান্য বিভাগে কাজ করেছেন তাদেরকে প্রেষণে বা বদলি করে এনে এই পদগুলোতে বসানো হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় পদোন্নতি বা অন্য বিভাগ থেকে বদলি করে এনে এই পদগুলো পূরণ করার নিয়ম রয়েছে।[৪২] কিন্তু শুধুমাত্র অন্য বিভাগ থেকে বদলি করে এনেই পদগুলো পূরণ করা হয়ে থাকে, এখানে বিভাগীয় পদোন্নতির নিয়মটি মানা হয় না। নীতিমালায় যদি কত শতাংশ পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে তা উল্লেখ থাকতো, তাহলে এ নিয়মটি উপেক্ষা করার সুযোগ থাকতো না।

প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের পদগুলোতে যারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন, মাঠ পর্যায়ে তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকায়, মাঠ পর্যায়ের বাস্তব ও যৌক্তিক সমস্যাগুলো তারা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন না। এ কারণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সমস্যাগুলো তাদের কাছে তুলে ধরা হলেও, সে সমস্যাগুলোর প্রতি তারা ততটা মনোযোগী হন না। প্রকারান্তরে সমস্যাগুলো থেকেই যায়। প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে বসাতে হবে। এটি করার জন্য অন্য বিভাগ থেকে বদলি বা প্রেষণে আনার নিয়ম রহিত করে পদোন্নতির মাধ্যমে উল্লিখিত পদগুলো পূরণের নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে।

৩.২.২ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগের অভাব

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগের অভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এফজিডি থেকে জানা যায়, বিগত প্রায় এক দশকে কোনো পদোন্নতি হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা নিয়োগের বিধিমালায় নিম্নলিখিত উপায়ে শূন্য পদ পূরণের নিয়ম রয়েছে।

- বিভাগীয় অধঃস্তন কর্মকর্তাদের পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা।
- সরকারের অন্য বিভাগ (শিক্ষা সংশ্লিষ্ট) থেকে পদোন্নতি দিয়ে নিয়ে এসে শূন্য পদ পূরণ করা।
- সরকারের অন্য বিভাগের (শিক্ষা সংশ্লিষ্ট) সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি করে নিয়ে এসে শূন্য পদ পূরণ করা।
- সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা।

পদবিভিত্তিক নিয়োগের নীতিমালা নিম্নরূপ[৪৩]:

পদবি	বিশ্লেষণ
মহাপরিচালক	বিভাগীয় পদোন্নতি, অন্য বিভাগ থেকে বদলি
পরিচালক	বিভাগীয় পদোন্নতি, অন্য বিভাগ থেকে পদোন্নতি
উপ পরিচালক	বিভাগীয় পদোন্নতি, অন্য বিভাগ থেকে বদলি
সহকারী পরিচালক	বিভাগীয় পদোন্নতি, অন্য বিভাগ থেকে বদলি
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	বিভাগীয় পদোন্নতি ৮০%, সরাসরি নিয়োগ ২০%
সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	বিভাগীয় পদোন্নতি ৮০%, সরাসরি নিয়োগ ২০%
শিক্ষা কর্মকর্তা	বিভাগীয় পদোন্নতি ২/৩ অংশ, সরাসরি নিয়োগ ১/৩ অংশ
গবেষণা কর্মকর্তা	বিভাগীয় পদোন্নতি ৫০%, সরাসরি নিয়োগ ৫০%
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	এটিইও থেকে পদোন্নতি ২০%, সরাসরি নিয়োগ ৮০%
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সরাসরি নিয়োগ ১০০%

[৪১] প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০৭।

[৪২] বিস্তারিত জানতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, প্রজ্ঞাপন (ঢাকা, ৬ই আশ্বিন, ১৩৯৬/২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯) এর ২৬০ থেকে ২৬৫ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

[৪৩] বিস্তারিত জানতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, প্রজ্ঞাপন (ঢাকা, ৬ই আশ্বিন, ১৩৯৬/২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯) এর ২৬০ থেকে ২৬৫ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণের নিয়ম রয়েছে, অথচ শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না। বর্তামানে ৫৭ শতাংশ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ২৯ শতাংশ সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ২০ শতাংশ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ১৩ শতাংশ সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে।[৪৪] নির্দিষ্ট কোটা অনুযায়ী এই পদগুলোতে পদোন্নতি দেওয়া হলে, শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে গতিশীলতা ফিরে আসতো, তারা কাজে অধিক মনোযোগি হতো।

নীতিমালা পর্যালোচনায় দেখা যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোটা অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের বিধান রয়েছে। এই নিয়মের কারণে পদোন্নতির ক্ষেত্রটি সীমিত হয়ে যাচ্ছে। মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা মনে করেন, মাঠ প্রশাসনের সর্ব নিব স্তরের পদে সরাসরি নিয়োগের বিধান রেখে উপরের স্তরের সকল পদের সরাসরি নিয়োগের বিধান রহিত করতে হবে এবং এগুলো ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি দিয়ে পূরণের নীতি গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্থবিরতা কেটে যাবে এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে গতিশীলতা ফিরে আসবে। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগ দিয়ে উপরের স্তরের সকল পদগুলো পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণ করা যেতে পারে। কেননা, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে শুরু করে উপরের স্তরের সকল পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্নাতকোত্তর নির্ধারণ করা হয়েছে, কাজেই উল্লিখিত নিয়মটি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৩.২.৩ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি

জনবলের দিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেবা খাত। এই খাতের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত পদ সংখ্যা ৯ হাজার ৯২টি। কিন্তু কর্মরত রয়েছে ৭ হাজার ২ শত ১২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। অর্থাৎ ১ হাজার ৮ শত ৮০টি বা ২০.৭ শতাংশ শূন্য পদ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা খাত সেবা দিয়ে যাচ্ছে (সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৪: প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে শূন্য পদের বিভাজন

বিভিন্ন পর্যায়	১ম শ্রেণী		২য় শ্রেণী		৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী		মোট	
	জন	%	জন	%	জন	%	জন	%
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৬	৮.৮	৭	৩১.৮	২১	১২.৮	৩৪	১৩.৪
বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	৫	২৭.৮	-	-	৬	১০.৭	১১	১৪.৯
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	৫৮	**৪২.৬**	২১	৩২.৮	৭৬	১৫.৩	১৫৫	২২.৩
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	১০৩	২০.২	২৭২	১২.৯	২১৯	১১.১	৫৯৪	১২.৯
প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	২৮০	৩৭.৪	-	-	২৭৫	**৩৪.০**	৫৫৫	**৩৫.৭**
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার	১১৮	২৪.৫	২৫১	**৫২.২**	১৬২	১৬.৮	৫৩১	২৭.৬
সর্বমোট	৫৭০	২৯.১	৫৫১	২০.৬	৭৫৯	১৭.০	১৮৮০	২০.৭

[সূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০৭]

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় এতগুলো পদ শূন্য থাকায় কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বাড়তি কাজ করতে হয়, যার ফলে কাজের মান ঠিক রাখা সম্ভব হয় না। তাছাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার প্রায় ১৩ শতাংশ পদ শূন্য থাকায় বিদ্যালয় মনিটরিং ও সুপারভিশন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। লোকবলের স্বল্পতার কারণে অনেক জায়গায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেরা চাঁদা দিয়ে স্থানীয়ভাবে লোক রেখে কার্যক্রম চালিয়ে থাকেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেওয়া এই কর্মীদের জন্য টাকার সংস্থান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নানা প্রকার অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়তে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য অনতি বিলম্বে শূন্য পদগুলো পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

৩.২.৪ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ বহির্ভূত কাজ করা

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজেই সম্পৃক্ত নন, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজেও সম্পৃক্ত হতে হয়। বিশেষকরে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন তদন্তভার তাদের উপর অর্পণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জরিপ ও রিলিফ বিতরণ তদারকিতে তাদেরকে যুক্ত হতে হয়। অনেক সময় খোলা বাজারে চাল বিক্রি তাদেরকে দিয়ে মনিটরিং করানো হয়। এমনিতেই প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঘাটতি রয়েছে, তার ওপর তাদেরকে এ সব কাজে যুক্ত করার ফলে তাদের রুটিন কাজ প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

[৪৪] প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০৭।

৩.২.৫ বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের যাতায়াত ভাতার স্বল্পতা

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সুপারভিশনের দায়িত্ব সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার উপর ন্যাস্ত। একজন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অধীনে রয়েছে ২০-২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাসে একজন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ১০টি করে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সুপারভিশন করতে হয়। জনবলের অভাবে কোনো কোনো কর্মকর্তাকে দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। অথচ একজন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে মাসে যাতায়াত ভাতা দেওয়া হয় মাত্র ২০০ টাকা। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যা উপজেলা শহর থেকে অনেক দূরে যেখানে যেতে একদিনেই ২০০ টাকা খরচ হয়ে যায়। বিশেষকরে পাহাড়ী এলাকায় এই সমস্যা ব্যাপক। এমতাবস্থায় লক্ষ করা যায় যে, প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দূরের বিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পরিদর্শন হয় না। তাছাড়া অনেক কর্মকর্তা পরিদর্শিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে যাতায়াত ভাড়া নিয়ে থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ মনিটরিং ও সুপাভিশনের দুর্বলতার কথা প্রায়ই শোনা যায়। উল্লিখিত বিষয়টি এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ মনিটরিং ও সুপারভিশন নিশ্চিত করার জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধি করা দরকার।

অধ্যায় চার
প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

বাংলাদেশের অন্যান্য সেবা খাতের ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতও ত্রুটিমুক্ত নয়। এখানেও নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি বিরাজমান। এই অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হলো।

৪.১ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রাথমিক শিক্ষায় নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা প্রায়ই শোনা যায়। এর মধ্যে বেশ কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে বিদ্যালয় পর্যায়ে। বিদ্যালয় পর্যায়ে যে সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয় তার শিকার হন শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবক। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সাথে এফজিডি ও নিবিড় সাক্ষাৎকার হতে বিদ্যালয় পর্যায়ে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সেবার উপর টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ড জরিপ[৪৫] হতেও বিদ্যালয় পর্যায়ের কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে জানা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

৪.১.১ শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অনেক শিক্ষকের মধ্যে দায়িত্ব পালনে নানা অনিয়ম ও অবহেলা লক্ষ করা যায়। তারা সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসেন না, নিয়মিত ক্লাস নেন না, যত সময় ক্লাসে ব্যয় করার কথা তত সময় ক্লাসে ব্যয় করেন না, ক্লাসে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন না, নিয়মিত হোম ভিজিট করেন না, বিদ্যালয়ে নিয়মিত জাতীয় সংগীত অনুষ্ঠান করেন না প্রভৃতি। রিপোর্ট কার্ড জরিপ হতে শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম সংক্রান্ত নিম্নের চিত্র পাওয়া যায় (সারণি ৪.১)।

সারণি ৪.১: শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম

অনিয়মের ধরণ	উত্তরদাতা খানা (%)
সঠিক সময়ে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে আসেন না	১৯
বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হয় না	৩২
ক্লাস পরিচালনার জন্য নির্ধারিত সময় ক্লাসে ব্যয় করা হয় না	৩৭
পড়ানোর সময় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় না	২২
শিক্ষকরা হোম ভিজিট করেন না	৭৪
বিদ্যালয়ে নিয়মিত জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় না	৩৪

[তথ্য সূত্র: রিপোর্ট কার্ড জরিপ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৬]

সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯ শতাংশ খানার মতে শিক্ষকরা সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসেন না, ৩২ শতাংশ খানার মতে বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হয় না, ৩৭ শতাংশ খানার মতে ক্লাস পরিচালনার জন্য নির্ধারিত সময় ক্লাসে ব্যয় করা হয় না, ২২ শতাংশ খানার মতে পড়ানোর সময় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় না, ৭৪ শতাংশ খানার মতে শিক্ষকরা হোম ভিজিট করেন না এবং ৩৩ শতাংশ খানার মতে বিদ্যালয়ে নিয়মিত জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় না।

শিক্ষকদের দায়িত্বের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে প্রশাসনিক মনিটরিং ও সুপারভিশন বাড়াতে হবে, পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোতে ম্যানেজিং কমিটির তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। এটি করার জন্য সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমস্যাগুলো করতে হবে এবং ম্যানেজিং কমিটিকে সক্রিয় করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.১.২ শিক্ষার্থীর নিকট থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফি বা চাঁদা গ্রহণ

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো ফি বা চাঁদা নেওয়ার নিয়ম নেই। তবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছ থেকে ৫ টাকা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর কাছ থেকে ১০ টাকা করে পরীক্ষার ফি নেওয়ার নিয়ম আছে।[৪৬] তবে এ নিয়ম মানা হয় না, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উল্লিখিত পরমিাণের চেয়ে বেশি ফি নেওয়া হয়। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সাথে এফজিডি হতে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন খাতে ফি বা চাঁদা নেওয়া হয়। যেমন ভর্তি ফি, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের চাঁদা, বিদ্যালয় পরিস্কার

[৪৫] ২০০৬ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সিলেট, পিরোজপুর, ঝিনাইদহ, ঝালকাঠি, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, যশোর, সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল ও চকরিয়া এলাকায় ৩,৮৯৮টি খানার উপর প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে জরিপ করে এলাকাভিত্তিক ১০টি রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেছে। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে এ গবেষণায় সেখান থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

[৪৬] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিপত্র, স্মারক নং-প্রাগম/বিদ্যালয়-২/৪ অভিযোগ (ঢাকা)-৯/২০০০/৬২৭, তারিখ: ৭/৯/০৫।

পরিচ্ছন্ন করানোর জন্য চাঁদা, পঞ্চম শ্রেণীর বিদায় অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা, মিলাদের জন্য চাঁদা, উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বই আনার জন্য চাঁদা, তাছাড়া বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের জন্য চাঁদা। রিপোর্ট কার্ড জরিপে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফি বা চাঁদা নেওয়ার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিম্নরূপ (সারণি ৪.২):

সারণি ৪.২: শিক্ষার্থীর নিকট থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফি বা চাঁদা গ্রহণ

ফি/চাঁদার খাত	ফি বা চাঁদা প্রদানকারী খানা (%)	গড় টাকার পরিমাণ
প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি	৫৫	২৩
১ম ও ২য় শ্রেণী হতে অতিরিক্ত পরীক্ষা ফি গ্রহণ	৯৮	৫
৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী হতে অতিরিক্ত পরীক্ষা ফি গ্রহণ	৯৮	৯
বইয়ের জন্য চাঁদা	২৪	১২
ক্রীড়ানুষ্ঠানের চাঁদা	৩৮	১১
পঞ্চম শ্রেণীর বিদায়ের চাঁদা	১৮	১৩
মিলাদের চাঁদা	২৬	৯
বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের চাঁদা	১০	৯

[তথ্য সূত্র: রিপোর্ট কার্ড জরিপ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৬]

সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৫৫ শতাংশ খানার কাছ থেকে গড়ে ২৩ টাকা করে ভর্তি ফি নেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ৯৮ শতাংশ এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ৯৮ শতাংশ খানার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গড়ে যথাক্রমে ৫ ও ৯ টাকা করে অতিরিক্ত পরীক্ষা ফি নেওয়া হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বই আনার খরচের কথা বলে ২৪ শতাংশ খানার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গড়ে ১২ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য ৩৮ শতাংশ খানার কাছ থেকে গড়ে ১১ টাকা, পঞ্চম শ্রেণীর বিদায় অনুষ্ঠানের জন্য ১৮ শতাংশ খানার কাছ থেকে গড়ে ১৩ টাকা, মিলাদের জন্য ২৬ শতাংশ খানার কাছ থেকে গড়ে ৯ টাকা এবং বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের জন্য ১০ শতাংশ খানার কাছ থেকে গড়ে ৯ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বেশ কিছু নিয়মিত খরচ[৪৭] হয়ে থাকে। অথচ সে খরচ মেটানোর জন্য সরকার থেকে কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয় না। অন্যদিকে কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছোটো-খাটো ব্যয় মেটানোর কথা থাকলেও কল্যাণ সমিতি কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় থাকায় সে প্রক্রিয়াটিও নিষ্ফল। এমতাবস্থায় নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে টাকা নিয়ে বিদ্যালয়ের ছোটো-খাটো ব্যয় মেটানো হয়ে থাকে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এগুলো নেওয়ার কোনো অনুমতি না থাকায় শিক্ষকের এ কার্যক্রম অনিয়মের পর্যায়ে পরিগণিত হয়।

বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে সকল নিয়মিত খরচ রয়েছে সেগুলো উপেক্ষা করে চলার কোনো সুযোগ নেই। এগুলোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে, নতুবা স্থানীয়ভাবে উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সাপেক্ষে কতিপয় খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি নেওয়ার নিয়ম করা যেতে পারে।

৪.১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ২০০৩ সাল থেকে সারা দেশব্যাপী উপবৃত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কতিপয় শর্ত[৪৮] সাপেক্ষে দরিদ্র পরিবারের[৪৯] ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করে থাকে। তবে শুরু থেকেই উপবৃত্তি নিয়ে নানা অনিয়মের কথা শোনা যায়। অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার ও রিপোর্ট কার্ড জরিপ থেকে উপবৃত্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিত অনিয়মের কথা জানা যায়।

- স্থানীয় চাপ ও স্বজনপ্রীতির কারণে উপবৃত্তির আওতায় আসার উপযুক্ত নয় এমন কিছু শিক্ষার্থীকেও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।
- কোথাও কোথাও আগত কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন ও যাতায়াত খরচের কথা বলে অভিভাবকদের নিকট থেকে কিছু কিছু টাকা নেওয়া হয়। এ সম্পর্কে রিপোর্ট কার্ড জরিপে দেখা যায়, উপবৃত্তি বিতরণ করতে আসা কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন ও

[৪৭] সারণি ৩.২ এবং সারণি ৪.২ এ উল্লিখিত খাতের খরচ।

[৪৮] উপবৃত্তি পাওয়ার আসার শর্তসমূহ হলো: ১) দরিদ্র পরিবারের শিশু হতে হবে, ২) ৮৫ শতাংশ পাঠদিবসে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। ৩) তালিকাভুক্ত (১ম শ্রেণী ব্যতীত) ছাত্র-ছাত্রীর বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। (বিস্তারিত জানতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত উপবৃত্তির সংশোধিত পরিপত্র যার স্মারক নং প্রাগম/পরি-২/৩০/২০০৬/৩৯৩, তারিখ ২৬/০৭/২০০৬ দেখুন)

[৪৯] (ক) দুস্থ বিধবা নারীর পরিবার (খ) দিনমজুর (গ) অসচ্ছল পেশাজীবী, যেমন- জেলে, কুমার, কামার, তাঁতী, মুচী (ঘ) ভূমিহীন/০.৫০ শতাংশ জমির মালিক। (বিস্তারিত জানতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত উপবৃত্তির সংশোধিত পরিপত্র যার স্মারক নং প্রাগম/পরি-২/৩০/২০০৬/৩৯৩, তারিখ ২৬/০৭/২০০৬ দেখুন)

যাতায়াত খরচের কথা বলে ৫২.৭৯% খানার কাছ থেকে বছরে গড়ে ৫৭.২৯ টাকা করে নেওয়া হয়েছে।[৫০]

- অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এরূপ প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা এবং ম্যানেজিং কমিটি সকলে সম্মিলিতভাবে যুক্ত থাকে। তবে বর্তমানে এ ধরনের অনিয়মের পরিমাণ কমে গেছে।
- উপবৃত্তি বিতরণকালে ব্যাংক কর্মকর্তার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকেনা।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়। উপবৃত্তি কর্মসূচী র লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এ ক্ষেত্রে অনিয়ম করতে হবে। বর্তমানে জেলা পর্যায়ে মাত্র একজন উপবৃত্তি কার্যক্রম মনিটরিং কর্মকর্তা রয়েছেন। উপবৃত্তি কার্যক্রমকে স্বচ্ছ করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম মনিটরিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া দরকার।

৪.১.৪ শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয়ে অনিয়ম

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় করার জন্য দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী র আওতায় বিদ্যালয়গুলোতে শিখন শেখানো সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ২৯টি আইটেমের[৫১] শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ইতোমধ্যে অনেক বিদ্যালয়ে[৫২] ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে এ বরাদ্দ দেওয়া হবে। প্রতি বিদ্যালয় ৯ সদস্যবিশিষ্ট SLIP (School Level Implementation Plan) কমিটি গঠন করে এগুলো ক্রয় করার কথা। কমিটি সামগ্রী ক্রয় করে উপজেলা শিক্ষা অফিসে বিল জমা দিবেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মালামালের গুণাগুণ যাচাই করে চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করবেন। সামগ্রী ক্রয়ের সাথে উপজেলা পর্যায়ের কোনো শিক্ষা কর্মকর্তার সম্পৃক্ত হওয়ার নিয়ম নেই।

শিক্ষকদের সাথে এফজিডি এবং কয়েকজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে নিবের চিত্র পাওয়া যায়।

- কোথাও কোথাও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি তার মনোনীত ভেন্ডরের কাছ থেকে সামগ্রী ক্রয় করতে শিক্ষকদের বাধ্য করেন। সামগ্রী তার মনোনীত ভেন্ডরের কাছ থেকে ক্রয় করা না হলে, সেগুলো যথাযথ গুণগত মান সম্পন্ন হয়েছে- এই মর্মে তিনি প্রত্যয়ন করবেন না বলে শিক্ষকদের সতর্ক করে দেন।
- ভেন্ডরের সাথে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার গোপন চুক্তি থাকে বলে অনেক সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনে করেন। কোথাও কোথাও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের আতাত থাকে।
- যে প্রতিষ্ঠান থেকে সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে স্পেসিফিকেশন ও আইটেম নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে দেখা গেছে তারা ৭ থেকে সাড়ে ৭ হাজার টাকায় উল্লিখিত সামগ্রী সরবরাহ করে থাকেন।
- অব্যবহৃত টাকা থেকে ৫৫০ টাকা ভ্যাট প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট টাকা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি এবং প্রধান শিক্ষকের মধ্যে বণ্টন হয়ে থাকে।
- এ হিসেব অনুযায়ী শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয় বাবদ বরাদ্দের প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ অনিয়মের মাধ্যমে নষ্ট হয়।

সার্বিকভাবে বলা চলে, শিখন শেখানে সামগ্রী ক্রয়ের একটি বড় অংশ অনিয়মের মাধ্যমে নষ্ট হয়। এটি বন্ধের জন্য আশু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। অধিদপ্তর থেকে কোটেশনের মাধ্যমে ভেন্ডর নিয়োগ দিয়ে তাদের মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিখন শেখানো সামগ্রী পৌছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এ ক্ষেত্রে অনিয়ম রোধ হবে এবং অনেক অর্থ সাশ্রয় হবে।

[৫০] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সহায়তায় চকরিয়া সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) পরিচালিত 'প্রাথমিক শিক্ষা: একটি রিপোর্ট কার্ড জরিপ' ২০০৬।

[৫১] স্পেসিফিকেশন ও আইটেম সম্পর্কে জানতে দেখুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণাল, স্মারক নং প্রশিআ/প্রশি/টিএলএম/১৩৪/২০০৬/৯০৯৬/৪৮১, তারিখ: ১৪ মে ২০০৭।

[৫২] শিখন শেখানো সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ৫০০ বিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

৪.২ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। এ সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের সাথে এফজিডি, কেস স্টাডি এবং কতিপয় শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে জানা যায়। নিবে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৪.২.১ মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের সফলতা সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ভূমিকার উপর। কিন্ত এই গবেষণায় তাদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট অস্বচ্ছতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

কতিপয় শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়-

- অনেক কর্মকর্তা সঠিক সময়ে অফিসে আসেন না, আবার অফিসের সময় শেষ হবার আগেই অফিস থেকে চলে যান।
- কিছু কিছু কর্মকর্তা দুই-তিন দিন পর পর অফিসে আসেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে সকল দিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নেন ।
- কিছু কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি পেলেও উৎকোচ নিয়ে পেশাগত শাস্তি থেকে রেহাই দেন।

শিক্ষকদের সাথে এফজিডি থেকে জানা যায়-

- যে সকল বিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এবং উপজেলা অফিসের কাছাকাছি সেই বিদ্যালয়গুলোতে অল্প দিনের ব্যবধানে পরিদর্শন হয়।
- যে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ ভালো নয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে কদাচিৎ পরিদর্শন হয়।
- কিছু কিছু কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে বিদ্যালয় থেকে যাতায়াত খরচ নিয়ে থাকেন।
- আপ্যায়ন করা না হলে কিছু কিছু কর্মকর্তা শিক্ষকদের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদেরকে তাদের দায়িত্বের প্রতি অধিকতর মনোযোগী করতে হবে। এ জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪.২.২ শিক্ষকদের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে উপজেলা শিক্ষা অফিসে করণিক কর্তৃক দুর্নীতি

শিক্ষকদের সকল প্রশাসনিক কাজের কেন্দ্র বিন্দু হলো উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। কিন্তু কিছু কিছু উপজেলা শিক্ষা অফিসে কাজ করতে গিয়ে শিক্ষকরা করণিক কর্তৃক না প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকেন। শিক্ষকদের সাথে এফজিডি ও নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, উপজেলা শিক্ষা অফিসে শিক্ষকদের টাইম স্কেল, ইবি ক্রস, সার্টিফিকেট সংযুক্তিকরণ, বকেয়া বেতন, এরিয়া বিল, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রভৃতি কাজের জন্য করণিককে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে বার বার ঘুরেও কোনো লাভ হয় না, মাসের পর মাস ফাইল চাপা পড়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে একটি উপজেলার করণিক কর্তৃক কতিপয় কাজের জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ঘুষ নেওয়া হয়েছে তার চিত্র নিবরূপ:

সারণি ৪.৩: একটি উপজেলা শিক্ষা অফিসের করণিক কর্তৃক দুর্নীতির চিত্র

কাজের নাম	ঘুষের পরিমাণ
কারো বেতন বকেয়া থাকলে কাগজপত্র তৈরি করে বেতনের ব্যবস্থা করার জন্য	২৫০০
একই দিনে চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকের বেতন বৈষম্য থাকলে তা সমতা করার জন্য	২০০০
জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে অগ্রিম নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য	১০০০
দক্ষতা সীমা অতিক্রম হলে পরবর্তী সীমার ব্যবস্থা করার জন্য	৫০০
শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য	২০০

[তথ্য সূত্র: একটি উপজেলার ৭৯ জন শিক্ষক কর্তৃক করণিকের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে আবেদনের প্রতিলিপি]

এখানে উদাহরণ হিসেবে একটি উপজেলার চিত্র তুলে ধরা হলেও, শিক্ষকদের সাথে এফজিডি ও নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, অনেক উপজেলায়ই করণিক কর্তৃক উল্লিখিত কাজের জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া হয়ে থাকে।

৪.২.৩ শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি

শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন, সাবজেক্ট বেইজড, ইন-সার্ভিস, সাব-ক্লাস্টার প্রভৃতি ধরনের প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এর মধ্যে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন এবং সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার কথা জানা যায়।

সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন প্রশিক্ষণ

এটি এক বছর মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার তিন বছরের মধ্যে এই প্রশিক্ষণটি পাওয়ার নিয়ম রয়েছে। এটি আবাসিক প্রশিক্ষণ। পিটিআইতে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ কালে শিক্ষকের থাকা খাওয়াসহ সরকার থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। পিটিআই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিবলিখিত অনিয়মের কথা জানা যায়:

- এক বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন কোর্স চলাকালে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের (শিক্ষক) নিকট থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ১,০০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা চাঁদা নেওয়া হয়।
- বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, বুয়ার বিল, আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য চাঁদা, সুইপারের চাঁদা, মসজিদের উন্নয়নের জন্য চাঁদা, বৈদ্যুতিক মেরামত, পানির পাম্প মেরামত, দারোয়ানের বেতন প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে চাঁদা দিতে হয়।

সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ

প্রতি দুই মাস পর পর সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। ক্লাস্টারের কোনো একটি বিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে শিক্ষক প্রতি উপকরণ বাবদ ২৫ টাকা এবং ভাতা বাবদ ৩০ টাকা করে বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান থেকে জানা যায় এই বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করা হয় না। এ ক্ষেত্রে নিবলিখিত অনিয়মের ঘটনা ঘটে থাকে:

- প্রশিক্ষণ উপকরণের জন্য ২৫ টাকা বরাদ্দ থাকলেও সমপরিমাণ টাকার উপকরণ দেওয়া হয় না।
- অনেক শিক্ষক জানেনেই না যে তাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ রয়েছে।
- কোথাও সম্পূর্ণ ভাতা দেওয়া হয়, কোথাও পরিমাণের চেয়ে কম দেওয়া হয় এবং কোথাও দেওয়া হয় না।
- যেখানে কোনো ভাতা দেওয়া হয় না, সেখানে যে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটিকে সকল শিক্ষকের জন্য খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বলা হয়।
- খাওয়ার বন্দোবস্তের জন্য কোথাও কোথাও অল্প কিছু টাকা দেওয়া হয় আবার কোথাও কোথাও দেওয়া হয় না।
- সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের বিল অনুমোদনের জন্য কিছু কিছু উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হয়।
- সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের জন্য অডিটের সময় ২০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ করতে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উপরণ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪.২.৪ শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া: অধিদপ্তর থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিজ নিজ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে চাকুরির আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। জেলা শিক্ষা অফিস বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে লিখিত পরীক্ষার চিঠি প্রেরণ করে। পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয় অধিদপ্তর থেকে। সারা দেশে একই সাথে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর উত্তরপত্রগুলো সিলগালা করে যথাশীঘ্র অধিদপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অধিদপ্তর কোনো এজেন্সিকে দিয়ে উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে উত্তরপত্রে কোড নম্বর দিয়ে দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীর নাম ঠিকানা আলাদা করে রাখা হয়। উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে কম্পিউটারে নম্বর এন্ট্রি করে রাখা হয়। অন্যদিকে নির্ধারিত তারিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান করে নম্বরপত্র অধিদপ্তরে পাঠিয়ে দেয়। অধিদপ্তর দুটি নম্বর একত্র করে তালিকা তৈরি করে। অতঃপর তালিকা হতে মেধাক্রম ও কোটা অনুযায়ী প্রার্থী বাছাই করে গেজেট আকারে সংশ্লিষ্ট জেলায় তালিকা পাঠিয়ে দেয়। সর্বোপরি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পুনরায় নির্বাচিত প্রার্থীর আবেদনপত্রসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রার্থী বরাবর নিয়োগপত্র প্রেরণ করে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কমিয়ে ১০ নম্বর করায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অবৈধ আর্থিক লেনদেন কিছুটা কমেছে। তবে নিম্নে উল্লিখিত অনিয়মের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন এখনো লক্ষ করা যায়নি:

- জেলা শিক্ষা অফিসকে ম্যানেজ করে পাশাপাশি সিট ফেলে এক জন অন্য জনকে দেখিয়ে পরীক্ষা দিয়ে থাকে।
- পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষা হলে দায়িত্বরত ব্যক্তি স্থানীয় হওয়ায় কেউ কেউ অসৎ উপায়ের সুযোগ পায়।
- পছন্দ অনুযায়ী পোস্টিং পাওয়ার জন্য কোথাও কোথাও ঘুষ লেন-দেনের ঘটনা ঘটে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক প্রার্থী তাদের পরিচিত কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তার পাশে বসিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ভাড়া করে এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কোনো কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে পাশাপাশি সিটের ব্যবস্থা করিয়ে নেয়। পরীক্ষা হলে উক্ত ভাড়া করা ব্যক্তিটি, যে তাকে ভাড়া করেছে তাকে নিজের খাতা দেখায়। অন্যদিকে পরীক্ষা হলে যারা পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তারা সাধারণত স্থানীয় এবং যারা পরীক্ষার্থী তারাও স্থানীয়, ফলে তারা বিষয়গুলো আমলে না এনে বরং সুযোগ করে দেন। এ অবস্থায় অনেক অযোগ্য প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে অনেক প্রার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগ পাওয়ার পর নিজের সুবিধা মত স্থানে পোস্টিং পাওয়ার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে তদবির করতে থাকে এবং ঘুষ দিয়ে পছন্দ মত বিদ্যালয়ে পোস্টিং নেয়।

এই অনিয়ম বন্ধ করতে হলে এক জেলার প্রার্থীদের অন্য জেলায় নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য সরকারি কর্ম কমিশনের আদলে একটি প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠন করে তার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া: কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য হলে উপজেলা শিক্ষা কমিটিকে[৫৩] বিষয়টি অবহিত করা হয়। শিক্ষা কমিটি স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দিলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষক নিয়োগের জন্য জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদনপত্র জমা দেওয়া শেষ হলে সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি আবেদপত্র যাচাই বাছাই করেন। অতঃপর উপজেলা শিক্ষা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ম্যানেজিং কমিটি প্রার্থী বরাবর চিঠি প্রেরণ করে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বা সহকারী কর্মকর্তা (যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর প্রশ্নকর্তা নিজেই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করেন। সর্বোপরি বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচিত প্রার্থীকে নিয়োগপত্র প্রদান করেন।

বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি:

- সাধারণত ম্যানেজিং কমিটির স্বজনদের মধ্যে থেকেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকে।
- পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে যে কোনো উপায়ে (প্রলোভন বা প্রভাব) ম্যানেজ করা হয়।
- বিদ্যালয় উন্নয়নের কথা বলে ২০ থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ডোনেশন নেওয়া হয়।
- ডোনেশনের টাকা বিদ্যালয় উন্নয়নে ব্যয় না করে অনেক সময় সংশ্লিষ্টরা বণ্টন করে নেয়।
- অনেক সময় অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

রেজিস্টার্ড ও সকল বেসরকরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। যারা শিক্ষক পেশায় আসতে চান তারা শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নিবন্ধিত হয়ে থাকবেন। পরবর্তীতে কোনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রয়োজন হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিয়োগ দিবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে এই ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করা হয়েছে। অতএব সুনির্দিষ্ট সুপারিশ হলো রেজিস্টার্ড ও সকল বেসরকারি পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের আদলে শিক্ষক নিবন্ধনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

---

[৫৩] উপজেলা শিক্ষা কমিটি: সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদস্য সচিব উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, অন্যান্য সদস্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক, বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক, একজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ও একজন বিদ্যোৎসাহী নারী।

৪.২.৫ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি

২৭ মার্চ ২০০৭ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং প্রগম/বিদ্যা-২/৭(বদলি নীতিমালা-১)/২০০৭/৮২৫ প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা বদলি সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা[৫৪] জারি করা হয়। এই নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে একই উপজেলার মধ্যে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, আন্তঃউপজেলা বদলির ক্ষেত্রে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, আন্তঃজেলা বদলির ক্ষেত্রে বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং আন্তঃবিভাগ বদলির ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বদলি সংক্রান্ত আদেশ প্রদান করেন। এই গবেষণায় একই উপজেলার মধ্যে বদলি সংক্রান্ত আদেশের ক্ষেত্রে নীতিমালার বিধান 'চ' এবং 'ড' প্রয়োগে কিছু কৌশল অবলম্বন করে অনিয়ম ও দুর্নীতি করতে দেখা যায়।

বিধান 'চ' এবং 'ড' নিবরূপঃ

চ) যে সকল বিদ্যালয়ে ৪ (চার) জন বা তার কম সংখ্যক শিক্ষক রয়েছে সে সকল বিদ্যালয় থেকে প্রতিস্থাপন ব্যতিরেকে বদলি করা যাবে না। প্রতিস্থাপন ব্যতিরেকে কোনো শিক্ষকের বদলি একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালকের অনুমতিক্রমে বদলি করা যাবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হবে না মর্মে সুনিশ্চিত হয়ে বদলির অনুমতি প্রদান করবেন।

ড) উপজেলার মধ্যে একই পদে একাধিক বদলিযোগ্য আগ্রহী প্রার্থী থাকলে উক্ত পদে বদলির জন্য চাকুরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তা উপজেলা শিক্ষা অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। কোনো অবস্থাতেই জ্যেষ্ঠতার তালিকা লঙ্ঘন করে বদলি করা যাবে না।

বদলির ক্ষেত্রে যেভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়

- যেহেতু বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় চার শিক্ষক বিশিষ্ট, সে কারণে প্রতিস্থাপন ছাড়া বদলির সুযোগ খুবই কম। কিন্তু কোথা থেকে কাকে প্রতিস্থাপন করে আনা যাবে তা নির্ভর করছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার উপর। কাজেই এই জটিল প্রক্রিয়াটি ঘুষ ছাড়া সম্পন্ন হয় না।
- শিক্ষকদের মধ্যে পক্ষ-বিপক্ষ রয়েছে। বদলির ক্ষেত্রে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুর্নীতি করা হয়। কোনো শিক্ষক তার পছন্দমত কোনো বিদ্যালয়ে বদলির জন্য আবেদন করলে তার চেয়ে জ্যেষ্ঠ বিপক্ষের কোনো শিক্ষককে উদ্বুদ্ধ করে ঐ পদে বদলির জন্য দরখাস্ত করানো হয়। এমতাবস্থায় দর কষাকষির মাধ্যমে ঘুষ লেনদেন হয়।

বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরনের বদলির ঘটনা দেখা যায়। যথা প্রশাসনিক শাস্তি মূলক বদলি, শিক্ষক সমন্বয় জনিত বদলি এবং স্বেচ্ছায় বদলি। শিক্ষকদের মতে স্বেচ্ছায় বদলির জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও ঘুষ ছাড়া বদলি সংঘটিত হয় না। বদলির ক্ষেত্রে দুর্নীতির চিত্র উদ্ঘাটনের নিমিত্তে এই গবেষণায় একই উপজেলার মধ্যে বদলি সংক্রান্ত পাঁচটি কেস স্টাডি করা হয়েছে। উক্ত কেস স্টাডিগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় শিক্ষকদেরকে স্বেচ্ছায় বদলি হতে সর্বনিব ২,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১২,০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছে। জানা যায়, আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগ বদলির ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বেশি। উল্লেখ্য শিক্ষকদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের স্বেচ্ছায় বদলি হতে অপেক্ষাকৃত কম ঘুষ লাগে।

বক্স- ২: শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি

মোঃ কামরুজ্জামান (ছদ্ম নাম) একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। পূর্বে তিনি অন্য একটি বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। বিদ্যালয়টি তার বাড়ি থেকে দূরে থাকায় যাতায়াতে বেশ সমস্যা ছিল। কিছুদিন আগে তার বাড়ির কাছে একটি বিদ্যালয়ে পদ শূন্য হলে সেখানে বদলি হয়ে আসার জন্য তিনি আবেদন করেন। একই পদে আসার জন্য আরো তিন জন আবেদন করেছিলো। এর মধ্যে দুইজন ছিলো চাকরির বয়স অনুযায়ী তার চেয়ে জ্যেষ্ঠ। এ অবস্থায় তার বদলি নিশ্চিত করার জন্য তিনি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করতে থাকেন। অবশেষে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ৩,০০০ টাকা এবং অফিসের করণিককে ১,০০০ টাকা ঘুষ দিয়ে তিনি তার পছন্দমত বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসেন। [বদলির তারিখঃ মে ২০০৭]

[৫৪] সম্পূর্ণ নীতিমালাটি http://www.dpe.gov.bd/pdf/T_Transfer_Rules_07.pdf এই ওয়েবসাইটে দেখুন।

৪.২.৬ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি

বেসরকারিভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রথমেই একটি কমিটি গঠন করতে হয়। অতঃপর উক্ত কমিটি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়ে জায়গা নির্বাচনপূর্বক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এভাবে কিছু দিন সফলভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পর লিখিত অনুমতির জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর দরখাস্ত করতে হয়।

আবেদন প্রক্রিয়া: ম্যানেজিং কমিটি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দরখস্ত করেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে কাগজপত্র যাচাই করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে কাগজপত্র যাচাই করে বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেন। উপ-পরিচালক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন

চিত্র ৪.১: বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে নিবন্ধন পর্যন্ত আবেদন প্রক্রিয়া

ম্যানেজিং কমিটি → উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস → জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস → বিভাগীয় উপ-পরিচালক

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে নিবন্ধন পর্যন্ত তিনটি ধাপ: প্রথম পর্যায়ে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এক বছরের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথম বছর সফলতার সাথে সমাপ্ত করা হলে পূনঃ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে তিন বছরের অস্থায়ী নিবন্ধন দেওয়া হয়, অস্থায়ী নিবন্ধন কাল সফলভাবে সমাপ্ত করা হলে পুনরায় আবেদনের পরিপ্রক্ষিতে স্থায়ী নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

চিত্র ৪.২: বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি থেকে স্থায়ী নিবন্ধন

১ম ধাপ →	বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এক বছরের অনমতি
২য় ধাপ →	তিন বছরের অস্থায়ী নিবন্ধন
৩য় ধাপ →	স্থায়ী নিবন্ধন

অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনের প্রক্রিয়া: আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন তাদের সকলকে আপ্যায়ন করতে হয় এবং সম্মানী প্রদান করতে হয়, এমনকি অনেক কর্মকর্তার যাতায়াতের জন্য জ্বালানী খরচ দিতে হয়। এটা অনেকটা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। পরিদর্শনে এসে কর্মকর্তারা বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করে এবং অনুমতি বা নিবন্ধন দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এরূপ অবস্থায় তাদের সাথে অনৈতিক আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম রয়েছে। বিদ্যালয়ের সাথে প্রভাবশালী কেউ জড়িত থাকলে এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে তদবির করানো সম্ভব হলে অনৈতিক আর্থিক লেনদেন ছাড়াও বিদ্যালয় পরিচালনার অনুমতি ও নিবন্ধন পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে প্রচুর ঘুরাঘুরি করতে হয়।

ঘুষ লেনদেন ও তদবির: তিনটি কেস স্টাডির মধ্যে দুইটির ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেন সংঘটিত হয়েছে। ঘুষ প্রদান করা না হলে পরিদর্শনে আসা কর্মকর্তাদের রিপোর্ট বিদ্যালয়ের পক্ষে আসবেনা, সে কারণে ঘুষ দিতে হয়েছে। অন্য একটি কেস স্টাডিতে দেখা গেছে সেখানে ঘুষ লাগেনি। কারণ এই বিদ্যালয়টির উদ্যোক্তাদের সাথে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার যোগাযোগ রয়েছে। এই কর্মকর্তা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে নিবন্ধন পাওয়া পর্যন্ত তদবির করেছেন। যে দুইটি কেস স্টাডির ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেন হয়েছে তার একটির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লিখিত অনুমতি পাওয়ার জন্য ১৪,২০০ টাকা, তিন বছরের অস্থায়ী নিবন্ধন পাওয়ার জন্য ২০,০০০ টাকা এবং স্থায়ী নিবন্ধনের জন্য ২৮,৭০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। অন্য কেস স্টাডিতে দেখা গেছে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেতে ১০,০০০ টাকা, অস্থায়ী নিবন্ধন পেতে ৭,০০০ টাকা এবং স্থায়ী নিবন্ধন পেতে ৫,২০০ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে।

বক্স- ৩: বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি

প্রত্যন্ত একটি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্য ১৯৯৮ সালে আলিমপুর (ছদ্মনাম) বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি স্থায়ী নিবন্ধন লাভ করে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি পাওয়া থেকে শুরু করে স্থায়ী নিবন্ধন পেতে উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রায় ৬২ হাজার ৯০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অনুমতি লাভ

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সম্মতিক্রমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উদ্যোগ সমাপন করে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালকের লিখিত অনুমতি পেতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দরখাস্ত জমা দেওয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন, সাথে আসেন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। এ সময়

পরিদর্শন রিপোর্ট পক্ষে আনার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ২,০০০ টাকা এবং সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ৫০০ টাকা ঘুষ দেওয়া হয়। উপজেলা অফিস থেকে কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করার জন্য উপজেলা অফিসের ক্লার্ককে ঘুষ দিতে হয় ২০০ টাকা। কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরিত হলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। তার সম্মানী ও যাতায়াত খরচ হিসেবে তাকে ৫০০০ টাকা দিতে হয়। জেলা অফিস থেকে কাগজপত্র বিভাগীয় অফিসে পাঠানোর জন্য জেলা অফিসের করণিককে ৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। কাগজপত্র বিভাগীয় শিক্ষা অফিসে জমা হলে বিভাগীয় উপ-পরিচালক বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। তার সম্মানী ও যাতায়াত খরচ হিসেবে তাকে ৬,০০০ টাকা দেওয়া হয়। কিছু দিনের মধ্যেই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১ বছরের লিখিত অনুমতি পাওয়া যায়। বিদ্যালয় পরিচালনার অনুমতি পেতে মোট ব্যয় হয় ১৪,২০০ টাকা।

অস্থায়ী নিবন্ধন লাভ

এক বছরের অনুমতি শেষ হওয়ার কিছু দিন পূর্বেই অস্থায়ী নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়। উপজেলা ও জেলা অফিসের মাধ্যমে আবেদন করার কথা থাকলেও এসব অফিসের ঝামেলা ও ঘুষ এড়ানোর জন্য সরাসরি বিভাগীয় শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করা হয়। বিভাগীয় অফিসের করণিক জানায় যে, ৪০,০০০ হাজার টাকা দিলে সে সরাসরি স্থায়ী নিবন্ধনের ব্যবস্থা করে দিবে। তার কথার উপর ভরসা করতে না পেরে উপ-পরিচালকের সাথে কথা বলা হয়। তিনি অস্থায়ী নিবন্ধনের জন্য ৩০,০০০ টাকা দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত তার সাথে ২০,০০০ টাকায় চুক্তি হয় এবং তিনি তিন বছরের অস্থায়ী নিবন্ধন প্রদান করেন।

স্থায়ী নিবন্ধন লাভ

অস্থায়ী নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কিছু দিন পূর্বেই স্থায়ী নিবন্ধনের জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। তিনি সৎ মানুষ হওয়ায় তাকে কোনো ঘুষ দিতে হয় নাই। তার প্রতিবেদনসহ কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করা হয়। উপজেলা অফিস থেকে জেলা শিক্ষা অফিসে কাগজপত্র পাঠানোর জন্য উপজেলা অফিসের ক্লার্ককে ২০০ টাকা ঘুষ দেওয়া হয়। জেলা শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ৩,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিস থেকে বিভাগীয় শিক্ষা অফিসে গেলে উপ-পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করা হয়। উপ-পরিচালক স্থায়ী নিবন্ধন দেওয়ার জন্য ৫০,০০০ টাকা ঘুষ দাবি করেন। অতঃপর তার সাথে ২৫,০০০ টাকায় চূড়ান্ত হয়। বিভাগীয় শিক্ষা অফিসের করণিককে ৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। সর্বোপরি ২৮,৭০০ টাকা ঘুষের বিনিময়ে বিদ্যালয়টি ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থায়ী নিবন্ধন পায়।

৪.২.৭ বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এমপিওকরণে[৫৫] অনিয়ম ও দুর্নীতি

এমপিওকরণ প্রক্রিয়া: শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি প্রদানের জন্য এসএমসি'র সুপারিশসহ শিক্ষকের আনুষঙ্গিক কাগজপত্র প্রধান শিক্ষক উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার যাবতীয় কাগজপত্র প্রত্যায়িত করে জেলা যাচাই কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্তে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বরাবর প্রেরণ করেন। সমুদয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে জেলা শিক্ষা কমিটি বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করার পর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তাদের সিদ্ধান্তের রেজলুশন কপিসহ নির্ধারিত ফরমে বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের সুপারিশ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটে প্রেরণ করেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট এমপিও হওয়ার উপযুক্ততা যাচাই-বাছাই করে এমপিওভুক্তিকরণ ও বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রস্তাব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। মন্ত্রণালয় প্রস্তাব অনুমোদন করলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অফিস আদেশ জারি করে।

চিত্র ৪.৩: শিক্ষক এমপিওকরণের প্রক্রিয়া

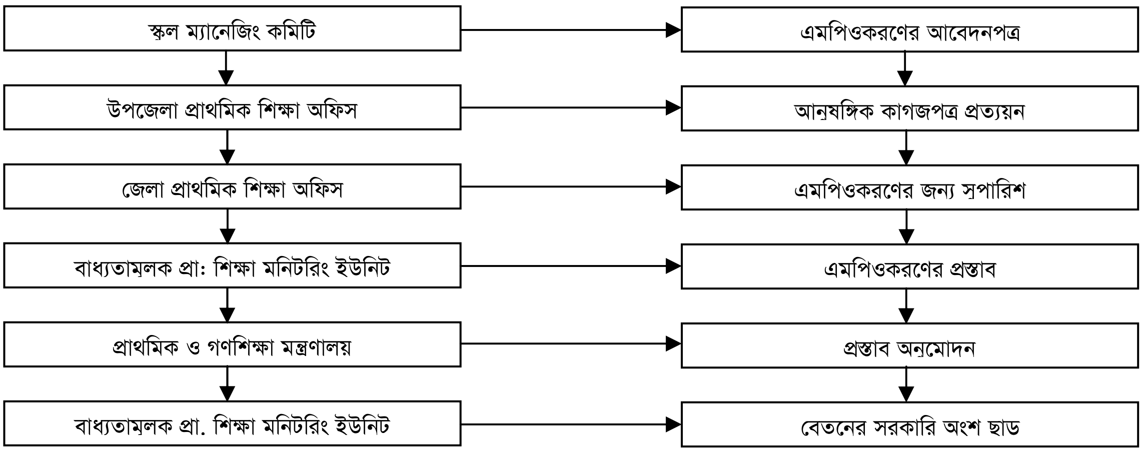

[৫৫] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেসরকারি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি মাসে বেতন বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশকে এমপিও বলে। এমপিও এর বর্ধিত রূপ হলো 'মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার'।

অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনের প্রক্রিয়া: কেস স্টাডি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশের এমপিও পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ বা তদবিরের প্রয়োজন হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিসে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার পর তা যাচাই বাছাই করে জেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে ঘুষ দিতে হয়, জেলা শিক্ষা অফিসে বোর্ড বসিয়ে শিক্ষক যাচাই বাছাইয়ের জন্য বোর্ড খরচ দিতে হয় এবং সর্বোপরি অর্থ ছাড় করানোর জন্য অধিদপ্তরে ঘুষ দিতে হয়। অন্যদিকে প্রভাবশালী কাউকে দিয়ে তদবির করাতে পারলে কোনো রকম ঘুষ লেনদেন ছাড়াই এমপিওভুক্ত হওয়া যায়।

ঘুষ লেনদেন ও তদবির: তিনটি কেস স্টাডির মধ্যে দুইটিতে এমপিও পেতে ঘুষ দিতে হয়েছে এবং একটিতে ঘুষ দিতে হয়নি। যারা ঘুষ দিয়ে এমপিও পেয়েছেন তারা জানান, তাদের পক্ষে তদবির করার লোক ছিলো না সে কারণে ঘুষ দিয়ে এমপিও পেতে হয়েছে। প্রতিটি স্কুল থেকে চার জন করে শিক্ষক এমপিও পেয়েছে। যে দুইটি কেস স্টাডিতে ঘুষ দিতে হয়েছে তার মধ্যে একটিতে আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করে জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠানোর জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে ৩,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে এবং বোর্ড খরচ বাবদ জেলা শিক্ষা অফিসে ২০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে, পাশাপাশি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে আরো ১২,৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে , তা সত্ত্বেও তাদের এমপিও চূড়ান্ত হয়নি। অন্য কেস স্টাডিতে দেখা গেছে, সেখানে উপজেলা শিক্ষা অফিসে কোনো ঘুষ দিতে হয়নি কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিসে ২,০০০ টাকা এবং অধিদপ্তর থেকে পরিদর্শন করানোর ৩,০০০ টাকা এবং অর্থ ছাড়া করানোর জন্য ২০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। যে ঘটনাটির ক্ষেত্রে কোনো ঘুষ লাগেনি সেটি সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা তদবির করেছেন।

বক্স- ৪: শিক্ষক এমপিওকরণে দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি

বিদ্যালয়টি নতুন প্রতিষ্ঠিত। ২০০৪ সালে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। ২০০৫ সালে শিক্ষক এমপিওকরণের জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দরখাস্ত জমা দেওয়া হয়। যাবতীয় যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলা অফিস থেকে কাগজপত্র জেলা অফিসে প্রেরণের জন্য উপজেলা অফিসের করণিককে ৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ব্যাক্তিগতভাবে কোনো ঘুষ দিতে হয়নি, তবে তার অনুরোধে উপজেলা অফিসের কম্পিউটারের কালি কিনে দেওয়ার জন্য ২,৫০০ টাকা প্রদান করতে হয়েছে। কাগজপত্র জেলা অফিসে প্রেরিত হলে সেখান থেকে শিক্ষক যাচাই-বাছাই করার জন্য বিদ্যালয়ে চিঠি আসে। চিঠির নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে সকল শিক্ষক জেলা শিক্ষা অফিসে যান। জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, জেলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাই করেন। জেলা শিক্ষা অফিস থেকে জানানো হয় যে, বোর্ড খরচ হিসেবে ৩০,০০০ টাকা দেওয়া হলে সকল শিক্ষককে এক সাথে এমপিওকরণের জন্য সুপারিশ করা হবে। নতুবা পর্যায়ক্রমে করা হবে। এ অবস্থায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে ২০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

জেলা শিক্ষা অফিস থেকে জানানো হয় যে কাগজপত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা মনিটরিং ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। অনেক দিন কেটে যায় কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা মনিটরিং ইউনিটে যোগাযোগ করা হলে সেখান থেকে জানানো হয় যে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক রিপোর্ট পেশ করলে তারা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি পরিদর্শনে আসার জন্য ২০,০০০ টাকা দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত ১০,০০০ টাকায় তিনি সম্মত হন এবং তাকে সম্পূর্ণ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তিনি পরিদর্শনে আসননি। আবার তার সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং তিনি পরিদর্শনে আসেন। তার গাড়ির জ্বালানি খরচ বাবদ তাকে পুনরায় ২,৫০০ টাকা দেওয়া হয়। এত কিছুর পরেও তিনি রিপোর্ট না দিয়ে সময় ক্ষেপণ করতে থাকেন। অবশেষে এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যান।

৪.২.৮ সরকারি শিক্ষকদের অবসরে গমন ও বিভিন্ন পাওনা বুঝে পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

অবসর গ্রহণ প্রক্রিয়া: অবসরে যাওয়ার এক বছর পূর্বে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জমা দিতে হয়। উপজেলা অফিস কার্যক্রম সম্পাদন করে কাগজপত্র জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠিয়ে দেয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কাজ শেষে কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে। উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করে থাকে। লক্ষণীয় যে, এই প্রক্রিয়ার সাথে ক) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস খ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং গ) হিসাবরক্ষণ অফিস জড়িত।

অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনের প্রক্রিয়া: অবসরে যাওয়ার জন্য কাগজপত্র প্রক্রিয়া করা থেকে শুরু করে অবসরে গমনের পর যাবতীয় দেনা-পাওনা বুঝে পাওয়ার প্রতিটি পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস প্রতিটি অফিসেই কম-বেশি ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে ফাইলপত্র যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেখানে সেই অবস্থায়ই থেকে যায়, হয়রানির শেষ থাকে না। বারবার ঘুরেও কোনো লাভ হয়না। সে কারণে কেউ কোনো ঝামেলায় না গিয়ে কিছু টাকা ব্যয় হলেও নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করিয়ে নেয়।

ঘুষ লেনদেন: এই গবেষণায় অবসরে যাওয়ার কাগজপত্র প্রক্রিয়া করা থেকে শুরু করে অবসরে যাওয়ার পর প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন পেতে কি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে তা জানার জন্য ছয়টি কেস স্টাডি করা হয়েছে। কেস স্টাডিগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়, অবসরে যাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পাদন ও এবং পেনশন পেতে সর্বনিম্ন ৮০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৭,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

বক্স- ৫: অবসরে গমন ও বিভিন্ন পাওনা বুঝে পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি

আহম্মেদ হোসেন। সহকারী শিক্ষক পদে ৩৪ বছর চাকুরী শেষে ২০০৬ সালে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যান। ছুটিতে যাওয়ার এক মাস আগে প্রয়োজনীয় কগজপত্র উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জমা দেন। কাগজপত্র জমা দেওয়ার সময় উপজেলা অফিসের ক্লার্ক তাকে বলেন *"আপনি এই অফিসের কাজের জন্য টাকা দিবেন? না-কি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ সকল কাজ করার জন্য চুক্তি করবেন।"* অতঃপর অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটির কাগজপত্র প্রক্রিয়া করার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ক্লার্ককে ১,৫০০ টাকা এবং জেলা শিক্ষা অফিসের ক্লার্ককে ১,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাওয়ার পর সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং লাম গ্র্যান্ড তোলার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ক্লার্কের কাছে ১,০০০ টাকা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ক্লার্ককে ২০০ টাকা এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের ক্লার্ককে ২০০ টাকা ঘুষ দেওয়া হয়। সবশেষে পেনশনের টাকা তোলার জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ১,৫০০ টাকা, জেলা শিক্ষা অফিসে ১,০০০ টাকা এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে ৫,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই ঘুষের টাকা অফিসের ক্লার্ক এর হাতে দিতে হয়েছে। এই ঘুষ দেওয়াটা প্রচলিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। সকলেই জানে যে, অবসরে গেলে ঘুষ দিতে হবে। সে কারণে এ নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না। বরং কথা বললে হয়রানি বেড়ে যায়, কাজ করাতে অনেক ঘুরতে হয়। সে কারণে কেউ কোনো কথা না বলে কাজ করিয়ে নেয়।

অধ্যায় পাঁচ
উপসংহার ও সুপারিশমালা

৫.১ উপসংহার

প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্তখাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। নানামুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে এই খাতের সফলতা অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন না নেওয়া, উপবৃত্তি প্রদান করা, বিনামূল্যে বই প্রদান করা প্রভৃতি। এছাড়া বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিও সরকার সক্রিয়।

সরকারের এই বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কতিপয় দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেমন ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর এনরোলমেন্ট প্রায় সমান, বরং মেয়ে শিশুর সংখ্যা ছেলে শিশুর তুলনায় সামান্য বেশি। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার গ্রস ও নীট এনরোলমেন্ট যথাক্রমে ৯৩.৭ ও ৮৭.২ শতাংশ। তবে প্রাথমিক শিক্ষার এই পরিমাণগত অর্জনে এখনো পরিতৃপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা এখনো অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসেনি, আবার যারা এসেছে তাদের প্রায় ৪৮ শতাংশ ঝরে পড়ছে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিয়েও কাঙ্ক্ষিত তুষ্টি এখনো পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে সরকারের বহুমুখী প্রচেষ্টা থাকলেও মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু সমস্যা বিরাজমান যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্বল্পতা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জনবলের ঘাটতি, বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার্থী অনুপাতে বসার জায়গার স্বল্পতা, বিদ্যালয় পরিচালনার আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে বরাদ্দের স্বল্পতা, নারী শিক্ষকদের প্রতি ম্যানেজিং কমিটি ও স্থানীয় জনগণের ইতিবাচক মনোভাবের অভাব, ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতির যথাযথ ভূমিকার অভাব, শিক্ষকদের উপর প্রশাসনিক ও শিক্ষা বহির্ভূত কাজের চাপ, শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতায় ভিন্নতা, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুযোগের স্বল্পতা, ঠিক মত বিদ্যালয় মনিটরিং ও সুপারভিশন না হওয়া, প্রশাসনিক কাজ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যা ছাড়াও নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতিসহ স্বজনপ্রীতির ঘটনা ঘটে থাকে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে নানা কৌশলে ঘুষ আদায় করা হয়। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন এবং শিক্ষক এমপিও'র আওতায় আনতে মোটা অংকের ঘুষ লেনদেন করতে হয়। সারা জীবন চাকরী শেষে শিক্ষক যখন অবসরে যান তখন তার হিসাব নিকাশ বুঝে পেতে ঘুষ দিতে হয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদেরকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রেও নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। পিটিআইতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে শিক্ষকদের কাছ থেকে নানা চাঁদা নেওয়া হয়। সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় না করে আত্মসাৎ করা হয়। চাকুরী জীবনে শিক্ষককে বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে, কিন্তু প্রতিটি পদে তারা নানা হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হন। টাইম স্কেল, প্রভিডেন্ট ফান্ডের লোন, এরিয়া বিল, বকেয়া বিল, সার্টিফিকেট সংযুক্তকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘুষ দিতে হয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনে আসলে অনেককে গাড়ির জ্বালানি খরচ প্রদান করতে হয়। শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী করার জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ এই উপবৃত্তি বিতরণেও নানা প্রকার অনিয়ম রয়েছে। এছাড়া শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা তো রয়েছেই। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক, একমাত্র পরীক্ষা ফি ছাড়া অন্য কোনো খাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি বা চাঁদা দেওয়ার নিয়ম নেই। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে চাঁদা নেওয়া হয়, পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি'র তুলনায় বেশি নেওয়া হয়। কোনো কোনো কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা অনেকটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়, অনেক ক্ষেত্রেই এই বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। সরকার থেকে শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করার কথা থাকলেও কিছু কিছু বিদ্যালয়ে বইয়ের জন্য টাকা নেওয়া হয়। এ রকম নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৫.২ সুপারিশমালা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি হতে উত্তরণের জন্য কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো। কিছু সুপারিশ গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কিছু সুপারিশ সরাসরি সাক্ষাৎকারদাতার কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের জন্য সুপারিশ

১. শিক্ষা সেবা উন্নত করার নিমিত্তে ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত ১:৩০ এ উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদীর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করার জন্য বিদ্যালয়ের সময়সূচি স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ করে তুলতে হবে।

৪. শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে ইউনিয়নভিত্তিক কোটা করে সেই ইউনিয়নের প্রার্থীদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে ঐ ইউনিয়নের মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে নিকটতম ইউনিয়ন থেকে নেওয়া যেতে পারে।

৫. শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করার জন্য পদক্রম বৃদ্ধি করা দরকার (যেমন সহকারী, সহকারী প্রধান এবং প্রধান শিক্ষক) এবং শুধুমাত্র সহকারী শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগ ও অন্য পদ পদোন্নতি দিয়ে পূরণ করতে হবে।

৬. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো বর্তমান জীবন যাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি করা দরকার।

৭. সরকারি, রেজিস্টার্ড এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ব্যবধান কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮. সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত। অর্থাৎ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের তুলনায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের বেতন স্কেল বেশি এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাশের তুলনায় স্নাতক শ্রেণী পাশের বেতন স্কেল বেশি হবে।

৯. বিদ্যালয় পরিচালনার আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয়ভাবে উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সাপেক্ষে কতিপয় খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি নেওয়ার নিয়ম করা যেতে পারে।

১০. সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এক জেলার প্রার্থীদের অন্য জেলায় পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

১১. রেজিস্টার্ড ও সকল বেসরকারি পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক বাছাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের পদে মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

১৩. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে অন্য বিভাগ থেকে বদলি বা প্রেষণে আনার নিয়ম রহিত করা এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগ ও উপরের সকল পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের নীতি গ্রহণ করা উচিত।

১৪. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে বর্তমানে ২০.৭ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। যথাশীঘ্র সম্ভব এই শূন্য পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

১৫. জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করাসহ বিদ্যালয়গুলোর কন্টিনজেন্সি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিত।

প্রশাসনিক পর্যায়ের জন্য সুপারিশ

১৬. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে শিক্ষকদের হয়রানি বন্ধ ও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা দূর করতে সকল অফিস বোর্ডে কোন কাজ কত দিনে সম্পন্ন হবে তার তালিকা প্রদর্শন করতে হবে।

১৭. শিক্ষকদের শিক্ষা বহির্ভূত কাজে যুক্ত না করা এবং যথাসম্ভব প্রশাসনিক কাজের চাপ কমানোর জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একজন করে অফিস সহকারী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

১৮. মাঠ পর্যায়ে সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ উপকরণ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভাতা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৯. উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বিদ্যালয়ে বই নেওয়ার জন্য থোক বরাদ্দের পরিবর্তে প্রকৃত ব্যয় প্রদান করা উচিত।

২০. সহকারী উপজেলা এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা যাচাইপূর্বক তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। নতুন নিয়োগ দেওয়া কর্মকর্তাদের অবশ্যই বেসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মস্থলে পাঠানো উচিত।

২১. শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষককে এই প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

২২. প্রশাসনিক কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাতায়াতের জন্য প্রধান শিক্ষকের যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

২৩. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বাস্তবসম্মত যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

২৪. অধিদপ্তর থেকে কোটেশনের মাধ্যমে ভেন্ডর নিয়োগ দিয়ে তাদের মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিখন শেখানো সামগ্রী পৌছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

২৫. নারী শিক্ষকদের প্রতি পুরুষ শিক্ষক, অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটির নেতিবাচক মনোভাব দূর করতে তাদেরকে জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য সুপারিশ

২৬. সরকার থেকে শিক্ষার্থীরা কি কি সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং এগুলো পেতে শিক্ষার্থীর কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে সে সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।

২৭. শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিকল্পে মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও অভিভাবক সভা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। স্থানীয় এনজিওকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

২৮. পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রেণী পরিচালনা এবং পাঠদান নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়গুলোতে উপজেলা শিক্ষা অফিসের মনিটরিং ও সুপারভিশন আরো বাড়াতে হবে।

২৯. এসএমসি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতিকে কার্যকর করতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে তাদেরকে দিয়ে বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা করিয়ে সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাতে হবে।

৩০. এসএমসি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তাদের কাজের উপর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩১. এসএমসি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতির ৫০ শতাংশ পদে নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে হবে।

৩২. এসএমসি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এবং কল্যাণ সমিতির সদস্যদের মাঝে মাঝে ফলোআপ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. রহমান, মো. সিদ্দিকুর (২০০৪), *শিক্ষকদের কথা*, ঢাকা, সামসুদ্দিন বুক হাউজ।

২. পিপিআরসি (২০০৬), প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদন *'হালখাতা'*, ঢাকা, সুশিক্ষা আন্দোলন।

৩. পিপিআরসি (২০০৮), প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদন *'হালখাতা'*, ঢাকা, সুশিক্ষা আন্দোলন।

৪. সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (২০০৫), *পিআরএসপি ও আপনি*, ঢাকা।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০০০), *জাতীয় শিক্ষানীতি*, ঢাকা।

৬. খান, আনসার আলী (২০০২), *বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা ও চট্টগ্রাম, কামরুল বুক হাউস।

৭. রহমান, ড. ফজলুর (২০০৫) *বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা ও চট্টগ্রাম, কামরুল বুক হাউস।

৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ সংবিধান* (২০০০), ঢাকা।

৯. আলী, প্রফেসর এম.এইচ (২০০৫), *সেলফ অ্যাসেসমেন্ট: বাংলাদেশ বিষয়াবলী*, ঢাকা, মিলারস্ প্রকাশনী।

১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রণালয় (২০০১), *অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ঢাকা।

১১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (১৯৯৭), প্রজ্ঞাপন, সারক নং প্রাগবি/প্রশা-৪/১০এম-৭/৮৬/৭৫৮, ঢাকা।

১২. ActionAid Bangladesh (2006), *Rereading PEDP II: A Critical View of the Outcomes Anticipated*, Commonwealth Education Fund Bangladesh.

১৩. Government of Bangladesh and United Nations Country Team in Bangladesh (2005), *Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report*, Dhaka.

১৪. Government of Bangladesh, Director of Primary Education (2006), *Baseline Report of Second Primary Education Development Programme*, Dhaka.

১৫. CAMPE (2005), *Education Watch*, Dhaka.

১৬. Karim, Shahnaz (2004), Transparency In Education "*Report Card in Bangladesh*" Paris: International Institute for Educational Planning, www.unesco.org/iiep.

১৭. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (2006), *Bangladesh Educational Statistics*, Dhaka.

১৮. Ministry of Primary and Mass Education of Bangladesh, www.mopme.gov.bd/CPEIMU_responsibility.htm (accessed on 10/07/2007).

১৯. Directorate of Primary Education, www.dpe.gov.bd (accessed on 02/15/2007).

২০. www.undp.org/mdg/tracking_targetlist.shtml (accessed on17/09/2007).

২১. www.nationmaster.com/red/graph/edu_pup_rat_pri-education-pupil-teacher-ratio-ori. (accessed on 4/05/2008)

২২. www.unicef.org/india/education_1551.htm (accessed on 4/05/2008)

পরিশিষ্ট ১: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলী[১]

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঁচটি বিভাগ রয়েছে যার মাধ্যমে অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। নিবে অধিদপ্তরের কার্যাবলী উল্লেখ করা হলো:

- **প্রশাসনিক বিভাগ:** কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এই বিভাগের দায়িত্ব। বিভাগীয় পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রভৃতির প্রশাসনিক কার্যাবলীর তদারকি হয়ে থাকে এই বিভাগটির মাধ্যমে।
- **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ:** এই বিভাগটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সুপারভিশনের দায়িত্বও এই বিভাগের উপর অর্পিত। এ বিভাগটি উন্নয়ন বাজেট তৈরি এবং অনুমোদিত অর্থ যথাযথ খাতে বিতরণ এবং বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থাপনা করে থাকে। বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং সমন্বয় সাধন এই বিভাগের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।
- **প্রশিক্ষণ বিভাগ:** প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম এই বিভাগের অন্তর্গত। এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ চাহিদা যাচাই এবং প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করা, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি এবং অভিভাবকের জন্য বিভিন্ন ছোট ক্লাস্টারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। পিটিআই প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের দায়িত্ব।
- **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ:** এই বিভাগ মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ এবং ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বই বিতরণ, মাঠ পর্যায়ে বিদ্যালয় তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার কাছে রিপোর্ট পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতিও এই বিভাগের দায়িত্ব।
- **পলিসি এবং অপারেশন বিভাগ:** এটি নতুন প্রতিষ্ঠিত একটি বিভাগ। এই বিভাগটি মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন পূর্বক পরবর্তী করণীয় ঠিক করার জন্য মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে। এই বিভাগটি শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর করতে অ্যাডভাইজারি ভূমিকা পালন করে থাকে।
- **ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সেল:** এটি অধিদপ্তরের একটি পৃথক সেল। সুনির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটা ব্যাংক তৈরি করা এই সেলের দায়িত্ব।

পরিশিষ্ট ২: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কার্যাবলী[২]

১. শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী

- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা ও তা বাস্তবায়ন করা।
- শ্রেণী ভিত্তিক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সে অনুযায়ী একাডেমিক কার্যাবলী পরিচালনা করা।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি ও হাজিরা খাতায় নাম লিপিবদ্ধ করা।
- প্রতি মাসে প্রত্যেক শ্রেণীর হাজিরা রেজিস্টারে ছাত্রছাত্রীর নামের তালিকা নবায়নপূর্বক বিভিন্ন প্রকার ছুটি ও পর্ব উল্লেখসহ দৈনন্দিন উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির হিসাব সংরক্ষণ করা।
- দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সে অনুযায়ী ক্লাস অনুষ্ঠান করা।
- পাঠটিকা তৈরি করা এবং সে অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনা করা।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরীক্ষা ফি সংগ্রহ ও তার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করা।
- প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্য বছরে তিনটি করে পরীক্ষা আয়োজন করা, পরীক্ষার খাতা দেখা এবং ফলাফল প্রকাশ করা।
- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নতুন শ্রেণীতে নাম লিপিবদ্ধ করা।
- উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে নতুন বই সংগ্রহ করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা।

---

[১] www.dpe.gov.bd/management_dpe.php (accessed on 10/07/2007).

[২] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎকার।

- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে পুরাতন বই সংগ্রহ করা এবং সেগুলো বাছাই করে শিক্ষার্থীদের মাঝে পুনরায় বিতরণ করা।
- উপবৃত্তির প্রদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থী বাছাই করা এবং তাদের জন্য উপবৃত্তি কার্ড তৈরি করা।
- উপবৃত্তির চাহিদাপত্র তৈরি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
- উপবৃত্তি বিতরণ করা এবং এর মাস্টাররোল ও অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষণ করা।
- বৃত্তি পরীক্ষার কোচিং করা।
- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।
- বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকার ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশু জরিপ করা।

২. প্রশাসনিক কার্যাবলী

- নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শ্রেণীকক্ষ ও অফিস খোলা এবং বিদ্যালয় শেষে শ্রেণীকক্ষ বন্ধ করা।
- বিদ্যালয় শুরু ও শেষ এবং প্রতি ক্লাসের পর ঘণ্টা বাজানো।
- প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ও অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা।
- দৈনিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ও টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা।
- প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সহকারী শিক্ষকদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শিক্ষকদের ছুটি অনুমোদন করিয়ে রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করা।
- ম্যানেজিং কমিটির সহযোগিতায় বিদ্যালয় গৃহের ছোটখাটো মেরামত ও কক্ষ সুসজ্জিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী

- ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন করার জন্য ভোটার তালিকা তৈরি করা এবং ভোটের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা।
- ম্যানেজিং কমিটির সভা আহবান করা, পরিচালনা করা এবং রেজলুশন বই সংরক্ষণ করা।
- শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা।
- কল্যাণ সমিতি গঠন করা ও প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা।
- শিক্ষকদের নিয়মিত সভা করা ও রেজলুশন বই সংরক্ষণ করা ।
- প্রধান শিক্ষকের শিক্ষা অফিসের বিভিন্ন মিটিং এ অংশগ্রহণ করা।
- দৈনন্দিন উপস্থিতি, অনুপস্থিতি নির্ধারণ সাপেক্ষে মাসিক রিটার্ন রিপোর্ট তৈরি করা।
- বিদ্যালয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন করা।
- বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটাসহ সাধারণ ক্যাশবই, কন্টিনজেন্সি ক্যাশবহি ও বিভিন্ন স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করা।
- ছাত্র তথ্য ছক পূরণ ও তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
- ছাত্রছাত্রীর ঝরে পড়ার সংখ্যা ও শতকরা হার নির্ধারণ করা।
- প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সমন্বিত মূল্যায়ন নির্ধারণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ।
- পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের তালিকা ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা।
- উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহসহ রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করা।
- মাঝে মাঝে মনিটরিং বোর্ডের তথ্য হালনাগাদ করা।
- সারা বছরই শিক্ষক শিক্ষিকার সহায়তায় উপজেলা শিক্ষা অফিসের চাহিদামত কাগজপত্র তৈরি করে সরবরাহ করা।
- বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরবর্তী পাঁচ বছর সময় কে কোথায় আছে সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা।

৪. শিক্ষা সহায়ক কার্যাবলী

- অভিভাবক সভার আয়োজন ও অনুষ্ঠান করা।
- উঠান বৈঠক আয়োজন ও অনুষ্ঠান করা।
- মা সমাবেশ আয়োজন ও অনুষ্ঠান করা।
- অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং শিক্ষার্থীদের হোম ভিজিট করা।

৫. সহশিক্ষা কার্যক্রম

- দৈনিক সমাবেশ ও জাতীয় সংগীত পরিচালনা করা।
- বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- আন্তঃস্কুল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।
- কাব স্কাউট পরিচালনা করা।
- ছাত্র ব্রিগেড সংগঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- মিনি পাঠাগার সংগঠন পরিচালনা করা।
- প্রত্যেক সপ্তাহে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী/ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
- বিদ্যালয় মাঠে ফুলের বাগান তৈরি ও তার পরিচর্যা করা।
- বিদ্যালয় আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপন ও তার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- শিক্ষা সপ্তাহ ও শিক্ষা পক্ষ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা।
- জাতীয় দিবসসমূহ পালন করা।

৬. শিক্ষা বহির্ভূত কার্যাবলী

- বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রছাত্রীর জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
- জনসংখ্যা জরিপ ও কৃষি জরিপ করা।
- ন্যায্যমূল্যে চাল বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।
- স্যানিটেশনের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।
- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণসহ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিকে সফল করা।
- রাষ্ট্রীয় কার্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ডাকা বিভিন্ন সভায় যোগদান করা ও তাদের সহযোগিতা করা।
- দেশে বিরাজমান যে কোনো প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারের জরুরি নির্দেশাবলী পালন করা।
- সাক্ষরতা জরিপ করা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা।
- বয়স্ক শিক্ষা ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় জরিপ, শিক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষক নির্বাচন প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করা।
- বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা।
- জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও বিভিন্ন সময়ে ভোট গ্রহণ কাজে অংশগ্রহণ করা।

পরিশিষ্ট ৩: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গঠন প্রণালী

ক্র.নং	কমিটির সভাসদবৃন্দের পরিচিতি	পদ	সংখ্যা
১.	বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (পদাধিকার বলে)	সদস্য-সচিব	১
২.	বিদ্যালয় এলাকার একজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ	সদস্য	১
৩.	বিদ্যালয় এলাকার একজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা	সদস্য	১
৪.	বিদ্যালয়ের একজন জমিদাতা (যদি থাকেন)	সদস্য	১

৫.	বিদ্যালয়ের নিকটতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা (সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত এবং রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য	১
৬.	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি	সদস্য	১
৭.	মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্য হতে নির্বাচিত একজন অভিভাবক	সদস্য	১
৮.	ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্য হতে নির্বাচিত চারজন অভিভাবক	সদস্য	৪

পরিশিষ্ট ৪: স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কার্যাবলী[৩]

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্কুল ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কার্যাবলী মনিটরিং, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক-ছাত্রের উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্যপরায়ণতা ও পাঠদানের উপর প্রতি জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসের ৭ তারিখের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট একটি করে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ (প্রতিবেদন চেয়্যারম্যান ও সদস্য-সচিব যুগ্মভাবে স্বাক্ষর করবেন)।
- উন্নয়নমূলক কাজ যেমন: বিদ্যালয়গৃহ ও রাস্তা নির্মাণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, অন্যান্য কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা প্রভৃতি।
- বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও তদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও ঝরে পড়া রোধ করা।
- প্রতিমাসে একবার কমিটির সভা অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ের কার্যাবলী ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।
- শিক্ষকদের মাসিক বেতন বিলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং তা কমিটির সদস্য-সচিব কর্তৃক উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করা।
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলী নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ ও উপজেলা শিক্ষা কমিটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা।
- সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সংস্কার ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সমাপ্তি প্রতিবেদনে ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে কমিটির সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর নিশ্চিত করা।
- উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে বিদ্যালয়ের জমি, রাস্তা, খেলার মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা করা।
- বিদ্যালয়গৃহ মেরামত, নতুন গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র মেরামত এবং অন্যান্য সকল কাজ তদারকি করা।
- পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ করা।
- বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম যেমন: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ও পক্ষ, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি কার্যক্রম সংগঠন ও সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান করা।
- শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।
- শিক্ষক অভিভাবক সমিতির সাথে সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- বিদ্যালয়ের সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং এ সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যালয় পরিদর্শনে সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

[৩] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রজ্ঞাপন, স্মারক নং প্রাগবি/প্রশা-৪/১০এম-৭/৮৬/৭৫৮, তারিখ: ০৯/১০/১৯৯৭

পরিশিষ্ট ৫: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং গঠন প্রণালী

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
২. শিক্ষক অভিভাবকদের যৌথ প্রয়াসে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য গৃহীত উদ্যোগকে জোরদার করা।
৩. বিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা।
৪. তৃণমূল পর্যায়ে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।
৫. শিক্ষক-অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মূল্যায়ন করা।
৬. স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধানকে উৎসাহিত করা।
৭. কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন।

শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির নির্বাহী কমিটির গঠন প্রণালী

ক্র.নং	কমিটির সভাসদবৃন্দের পরিচিতি	পদ	সংখ্যা
১.	সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন সদস্য	সভাপতি	১
২.	সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন সদস্য	সহ-সভাপতি	১
৩.	সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (পদাধিকার বলে)	সদস্য সচিব	১
৪.	সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হতে সাধারণ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত একজন শিক্ষক	সদস্য	১
৫.	সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকগণের মধ্য হতে সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিন জন পুরুষ অভিভাবক	সদস্য	৩
৬.	সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকগণের মধ্য হতে সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিন জন মহিলা অভিভাবক	সদস্য	৩

পরিশিষ্ট ৬: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কল্যাণ সমিতির লক্ষ্য ও গঠন প্রণালী

সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্য

১. প্রাথমিক শিক্ষর গুণগত মানোন্নয়ন।
২. বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকার শিশু জরিপ নিশ্চিতকরণ।
৩. বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।
৪. বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং তাদের বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত ধরে রাখা।
৫. বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।
৬. সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও র‍্যালী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে উদ্বদ্ধ ও শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন করা।
৭. বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপাবে স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে কাজে লাগানো।
৮. বিদ্যালয় এলাকার সকল অভিভাবকের জন্য এ সমিতির কার্যক্রম উন্মুক্ত রাখা।
৯. বিদ্যালয়ের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের বাজেটে স্থানীয় উদ্যোগে সম্পাদনযোগ্য কাজের আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দেওয়া।
১০. বিদ্যালয় একটি সামাজিক সম্পদ। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সকলের তা মনে রাখা।
১১. আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

কার্যকর কমিটির গঠন ও মেয়াদকাল

১. কলাণ সমিতির কার্যকর কমিটি হবে সাত সদস্যবিশিষ্ট।
২. কমিটিতে ১ জন সভাপতি, ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সদস্য সচিব, ১ জন কোষাধ্যক্ষ এবং ৩ জন সদস্য থাকবে।
৩. সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ সদস্যদের আলোচনা/নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হবে।
৪. কমিটির জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।
৫. সমিতির প্রতি আন্তরিক এরূপ ৩ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে ।
৬. কমিটির মেয়াদ কাল ২ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

পরিশিষ্ট ৭: ড. মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৪

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ (সার সংক্ষেপ)

- প্রাথমিক শিক্ষা হবে আট বছর মেয়াদী অর্থাৎ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা স্তর হবে প্রাথমিক শিক্ষা।
- তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুর জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।
- পাঁচ বছর বয়সের প্রতিটি শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- স্কুল ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে আগামী দশ বছরের মধ্যে আরো একশতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- দশ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছয় ধরনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই; এগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- ইংরেজি মাধ্যম, সাধারণ মাধ্যম, মাদ্রাসা মাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা একই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা পাবে।
- বছরে ২২০ দিন ছাত্র-শিক্ষক সংযোগকাল ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে বছরে ৭২০ ঘণ্টা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে বছরে ১২৭৫ ঘণ্টা পাঠ দান করাতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ছয় জন শিক্ষক ও ছয়টি শ্রেণী কক্ষ থাকতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর যথাযথ যোগান নিশ্চিত করতে হবে।
- পরীক্ষার ফলাফল ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে হবে যাতে শিক্ষা সম্পর্কে সবাই আগ্রহী হয় এবং ঝরে পড়ার হার কমে যায়।
- শিক্ষার্থী শতকরা ষাট ভাগ নম্বর পেলে তার জন্য বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধি করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ করতে হবে।
- শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশিষ্ট ৮: জাতীয় শিক্ষনীতি ২০০০ এ প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা

- প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করা হবে।
- ২০১০ সালের মধ্যে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- শিশুর ছয় বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৪০।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন। সব রকম প্রাথমিক বিদ্যালয় তা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে। যে সকল বিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন ক্রমে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান করবে তাদেরকে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ইংরেজিতে অনুবাদ করে টেক্সট বুক বোর্ড থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিষয়সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত শিক্ষা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানোর ব্যবস্থা

থাকবে এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করা হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক (competency based) ও আবশ্যকীয় শিখনক্রমের (essential learning continuum) ভিত্তিতে রচিত হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী পৃথক বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণীগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা: পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সহায়ক পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করতে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি কমিটির জাবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি গঠন করে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও এর মানোন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচ এস সি পাশ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক পাশ নারী বা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক এবং তিন বছরের মধ্যে সিএনএড[8] বা বিএড অর্জন করতে হবে।
- সকল সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন ও সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার জন্য মেধাভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠন করা হবে।
- শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল বস্তুনিষ্টভাবে বিন্যাস করে তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- প্রধান শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অন্যান্য শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে প্রধান শিক্ষকের উপর।
- প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে।
- প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ চালু রাখতে হবে। তবে দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের নীতিমালা পূনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের সচ্ছল শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিছু মূল্য নেওয়ার ব্যবস্থা বিবেচনা করা যায়।
- সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তক কিভাবে একাধিক শিক্ষাবর্ষে ব্যবহার করা যায় সে জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পুষ্টিকর টিফিন দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- বিদ্যালয়গুলোর পরিবীক্ষণ আরো জোরদার করতে হবে।

[8] সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন।

পরিশিষ্ট ৯: পিআরএসপি ও প্রাথমিক শিক্ষা

কৌশলগত লক্ষ্য	মূল লক্ষ্য	গৃহীত পদক্ষেপ/ প্রক্রিয়াধীন	পিআরএসপি'র নীতি এজেন্ডা (অর্থবছর ২০০৫-০৭)	ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার	দায়িত্ব
সকল শিশুর জন্য একমুখী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি	• প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি করে ১০০ তে উন্নীত করা • সবার জন্য একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা	• স্বীকৃত এই নীতির আলোকে NEC ২০০৩ এবং অন্যান্য দলিলাদিতে প্রস্তাবনা এসেছে	• কার্যকর শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলোকে ফোকাস করে সকল শিশুদের জন্য বাংলাভাষা, গণশিক্ষা ও জীবনমুখী শিক্ষা ভিত্তিক কারিকুলাম ও সহায়ক উপকরণ তৈরি করা	• চলমান কর্মসূচির অগ্রযাত্রা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি	• উপস্থিতির হার বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী শিশুর হার ৮০% এ উন্নীতকরণ • শিশুর ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স সমাপনকারী শিশুর হার ৬৮% হতে ৮০% উন্নীতকরণ • ঝরে পড়া ও বাদ পড়া শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন	• ৩,৫০,০০০ শহুরে কর্মজীবী শিশুদের জন্য নেওয়া শিক্ষা প্রকল্প এ বছর সম্পন্ন হবে • ৫,০০,০০০ বাদ পড়া শিশুদের শিক্ষার জন্য এনজিও এবং কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়তায় একটি কর্মসূচি পরিকল্পনাধীন রয়েছে	• বাস্তবসম্মত তথ্য ও পরিকল্পনা এবং সম্পদ আহরণের জন্য যুৎসই কৌশল সম্বলিত NPA তৈরি • শিক্ষা ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী সুযোগ হিসেবে অন্যান্য কম্প্লিমেন্টারি শিক্ষার ভূমিকাকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দান এবং এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা দান	• আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হতে বাদ পড়েছে বা বাদ পড়বে এমন শিশুদের জন্য জাতীয় নীতি তৈরি • সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে NPA গাইড লাইন অনুসরণ করা	এনজিও, এনজিও ব্যুরো এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন	• দক্ষতা এমন হতে হবে যাতে ৭০ শতাংশ শিশু যারা ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে তারা যাতে ন্যূনতম দক্ষতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে • প্রাথমিক শিক্ষার ৫ বছর শেষ হলে দক্ষতা যাচাই পরীক্ষার প্রবর্তন করা	• পিইডিপি ২য় প্রকল্প সফলভাবে শেষ হলে, তিন চতুর্থাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত হবে • পিইডিপি ২য় প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তাবিত সকল আদর্শমান অনুসরণ করে প্রাথমিক শিক্ষাদানকারী সকল সরকার ও এনজিও চালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া	• সরকারি ও এনজিও দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও মূল কারিকুলামের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছে	• মানসম্মত শিক্ষা সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত করা • ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক দক্ষতা অর্জন উপযোগী শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য কারিকুলাম, শিক্ষা উপকরণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে সাম্যতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ	• ছেলে মেয়েসহ সকল শিশুর এনরোলমেন্ট ১০০% নিশ্চিত করা • লিঙ্গ সাম্যতা টেকসইভাবে অর্জন করা • লিঙ্গ বিভেদ সফল ও কার্যকরভাবে দূর করা	• দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান • NCTB তে GAD সেল স্থাপন	• প্রাথমিক শিক্ষায় অন্যান্য ভাতাদি নিশ্চিত করা যাতে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা হতে ঝরে না পড়ে • কর্মমুখী শিক্ষা চালু করা যাতে অভিভাবকরা শিশুদের স্কুলে পাঠাতে অনুপ্রাণিত হয় • লিঙ্গভেদ, প্রান্তিক ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠী, অক্ষম ইত্যাদি বিবেচনায় ন্যায়সঙ্গত ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা কারিকুলাম চালু করা	• চলমান কর্মসূচি অগ্রগতি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তথ্য সূত্র: পিআরএসপি ও আপনি, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), এপ্রিল ২০০৬

পরিশিষ্ট ১০: বিভিন্ন প্রকারের ফটোকপি বাবদ বার্ষিক আনুমানিক ব্যয়[৫]

ক্র.নং	ফটোকপির খাত	টাকা
১.	রেজাল্ট বুক	৪৫.০০
২.	রিটার্ণ	১০০.০০
৩.	বেতন সীট	১৪.০০
৪.	হোম ভিজিট ফরম	১০০.০০
৫.	ম্যানেজিং কমিটির রেজলুশন	১৫.০০
৬.	ত্রৈমাসিক রিপোর্ট	১৫.০০
৭.	YS ফরম	১০.০০
৮.	ম্যানেজিং কমিটির চিঠি	১১৫.০০
৯.	পঞ্চম শ্রেণীর নামের তালিকা	৭.০০
১০.	ডি. আর. ফটোকপি	৩.০০
১১.	উপবৃত্তির তালিকা	২৪.০০
১২.	উপবৃত্তির চাহিদা	৬৫.০০
১৩.	উপবৃত্তির মাষ্টাররোল	৮৫.০০
১৫.	পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা	৮.০০
১৬.	কন্টিজেন্সি বিলের ভাউচার	৫০.০০
১৭.	উপবৃত্তির ভাউচার	১৪.০০
১৮.	কল্যাণ সমিতির কাগজপত্র	৩৯.০০
১৯.	পরিদর্শন প্রতিবেদন	২৪.০০
২০.	স্কুলের বার্ষিক প্রতিবেদন	৬.০০
২১.	শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন	১৪.০০
২২.	প্রথম শ্রেণীর ভর্তি রেজিষ্টার	১৭.০০
২৩.	শ্রেণী রুটিন	১০.০০
২৪.	শিশু জরিপ ফরম	৮.০০
২৫.	বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল	৩১.০০
২৬.	সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল	২০.০০
২৭.	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন চিঠি ও তথ্য ফরম	১২.০০
২৮.	মডেল টেস্টের ফলাফল	১২.০০
২৯.	বৃক্ষ রোপন তথ্য	১.০০
৩০.	অভিভাবক কমিটির চিঠিপত্র ও রেজ্যুলেশন	৩৬.০০
৩১.	বিভাগীয় বিভিন্ন তথ্য ছক	১২.০০
৩২.	বইয়ের চাহিদা	২.০০
৩৩.	বই বিতরণ তালিকা	৫.০০

[৫] একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০০৭ সালে বিভিন্ন ফটোকপি খাতে যে ব্যয় হয়েছে নমুনা হিসেবে তার একটি চিত্র উল্লেখ করা হলো।